পঞ্চভূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চভূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

সূচীপত্র

পরিচয়	৭
সৌন্দর্যের সম্বন্ধ	২০
নরনারী	৩২
পল্লিগ্রামে	৪৮
মনুষ্য	৫৮
মন	৭০
অখণ্ডতা	৭৬
গদ্য ও পদ্য	৮৭
কাব্যের তাৎপর্য	৯৯
প্রাঞ্জলতা	১১০
কৌতুকহাস্য	১১৬
কৌতুকহাস্যের মাত্রা	১২৪
সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ	১৩৩
ভদ্রতার আদর্শ	১৪১
অপূর্ব রামায়ণ	১৪৮
বৈজ্ঞানিক কৌতূহল	১৫৩

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 'ডায়ারি' 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' বা অন্য নামে কয়েক বৎসর ধরিয়া (মাঘ ১২৯৯ - কার্তিক ১৩০২) 'সাধনা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত। গ্রন্থে প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে সেই প্রকাশকালই মুদ্রিত হইল।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে ইহা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রচারিত; পরে 'পরিমার্জিত' ও পরিবর্জিত আকারে, ১৩১৪ বৈশাখে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের অঙ্গীভূত। ১৩৪২ চৈত্রে বিশ্বভারতী-কর্তৃক স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রচারের কালে যেমন 'বিচিত্র প্রবন্ধ' সংস্করণে 'পরিত্যক্ত পুরানো পাঠ' পুনরায় গ্রহণ করা হয়, তেমনি ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'নরনারী' প্রবন্ধের শেষে ৪৪ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদ হইতে প্রবন্ধের শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথ নূতন লেখা যোগ করেন।

উৎসর্গ

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
সুহৃদ্বরকরকমলেষু

পরিচয়

রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পারিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষত ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কী করিয়া।

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি তো আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

এখন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে সে সত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোনো সম্পর্ক রাখিতে চান না। তিনি বলেন, 'যে-সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কালে যখন জ্ঞানবিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানুষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল, তখন শৌখিন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর তো সে অবসর নাই। ছোটো ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলংকারে আচ্ছন্ন করিলে কোনো ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়া-দাইয়া আর কোনো কর্ম নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে,তাহাকে পায়ে নূপুর, হাতে

কঙ্কণ, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন। তাহাকে কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলংকার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।'

শ্রীমতী অপ্ (ইঁহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন, 'না, না, ও কথা কখনোই সত্য না। ও আমার মনে লইতেছে না, ও কখনোই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না।' কেবল বার বার 'না না, নহে নহে'। তাহার সহিত আর কোনো যুক্তি নাই, কেবল একটি তরল সংগীতের ধ্বনি, একটি অনুনয়স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন—'না, না, নহে নহে। আমি অনাবশ্যককে ভালোবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর কোনো উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে; পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই?'

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোনো যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কী!

শ্রীমতী তেজ (ইঁহাকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিষ্কাষিত অসিলতার মতো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন, 'ইস! তোমরা মনে কর পৃথিবীতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর। তোমাদের কাজে যাহা আবশ্যক নয় বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহা আবশ্যক হইতে পারে। তোমাদের আচারব্যবহার কথাবার্তা বিশ্বাস শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলংকার-

মাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেননা, সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং সময়ের বড়ো অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা চিরন্তন কাজ, ঐ অলংকারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গি, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য চালাইতে হয়। আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয় করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ন করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি ; এই জন্যই তোমাদের মাতার কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মতো এত বড়ো অসহায় এবং নির্বোধ জাতির কী দশাটা হয়।'

শ্রীযুক্ত বায়ু (ইঁহাকে সমীর বলা যাক) প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'ক্ষিতির কথা ছাড়িয়া দাও ; একটুখানি পিছন হঠিয়া, পাশ ফিরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া একটা সত্যকে নানা দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেই উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয় যে, বেচারার বহুযত্ননির্মিত পাকা মতগুলি কোনোটা বিদীর্ণ, কোনোটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই ও ব্যক্তি বলে দেবতা হইতে কীট পর্যন্ত সকলই মাটি হইতে উৎপন্ন ; কারণ, মাটির বাহিরে আর কিছু আছে স্বীকার করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকখানি নড়িতে হয়। উহাকে এই কথাটা বুঝানো আবশ্যক যে, মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ না কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার-শিক্ষার

কোনো সাহায্য করে না। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলংকার, যাহা কমনীয়তা, যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে, পরস্পরের পথের কণ্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং জীবনের প্রসার মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তারিত করে।'

শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া, বলিলেন, 'ঠিক মানুষের কথা যদি বলো, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। যে কোনো-কিছুতে সুবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে প্রতিদিন ঘৃণা করে। এইজন্য ভারতের ঋষিরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম একেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। বাহিরের কোনো-কিছুরই যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা আছে ইহাই জীবাত্মার পক্ষে অপমানজনক। সেই অত্যাবশ্যকটাকেই যদি মানব-সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপরে যদি আর কোনো সম্রাটকে স্বীকার না করা যায়, তবে সে সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।'

ব্যোম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে বেচারা পাগল বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না, অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অন্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভালো বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কখনো একেবারে উড়াইয়া দিই না। আমি তাহাকে বলিলাম, 'ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজেদের জন্য

করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই সর্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়। ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম এবং মানুষের প্রতি জড়ের যে শতসহস্র অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দূর করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়ন-পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজারূপে অভিষিক্ত করিলে আর তো মানুষের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে, মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহিত করা নিতান্ত আবশ্যক।'

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোনো যুক্তি খণ্ডন করিতে বসা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন; তাহার পর যে যাহা বলে তাঁহার গাম্ভীর্য নষ্ট করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেখানে ছিল সেইখানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফদাড়ি ও গাম্ভীর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই তো আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, 'তুমি তোমার ডায়ারি রাখ না কেন?'

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধ সংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে লোক নহি। বলা বাহুল্য, এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

সমীর উদার চঞ্চল ভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, 'লেখো-না হে!'

ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, 'ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।'

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তা থাক্, তুমি লেখো।'

স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, 'কী দোষ শুনি।'

আমি কহিলাম, 'ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎপরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই সহস্র ভাগ আছে, সব কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ; আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।'

কোথাও কিছুই নাই, ব্যোম বলিয়া উঠিলেন, 'সেই জন্যই তো তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল কর্মই নিষেধ করেন। কারণ, কর্মমাত্রই এক-একটি সৃষ্টি। যখনি তুমি একটা কর্ম সৃজন করিলে তখনি সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল। আমরা যতই ভাবিতেছি, ভোগ করিতেছি, ততই আপনাকে নানা-খানা করিয়া তুলিতেছি। অতএব বিশুদ্ধ আত্মাটিকে যদি চাও, তবে সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দাও।'

আমি ব্যোমের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, 'আমি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।'

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল, 'ডায়ারিকে কেন যে দ্বিতীয় জীবন বলিতেছ

আমি তো এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।'

আমি কহিলাম, 'আমার কথা এই— জীবন এক দিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায় তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল, কে নকল, ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।'

কথাটা ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, 'বুঝিয়াছি তুমি কী বলিতে চাও। স্বভাবত আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।'

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণু ভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা

শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহু যত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে— কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহু পূর্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম, 'সেই বটে।'

দীপ্তি কহিল, 'তাহাতে ক্ষতি কী ?'

আমি কহিলাম, 'যে ভুক্তভোগী সেই জানে। যে লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে। সাহিত্যব্যবসায়ীকে নিজের অন্তরের মধ্য হইতে নানা ভাব এবং নানা চরিত্র বাহির করিতে হয়। যেমন ভালো মালী ফর্মাশ অনুসারে নানারূপ সংঘটন এবং বিশেষরূপ চাষের দ্বারা একজাতীয় ফুল হইতে নানাপ্রকার ফুল বাহির করে— কোনো-টার বা পাতা বড়ো, কোনোটার বা রঙ বিচিত্র, কোনোটার বা গন্ধ সুন্দর, কোনোটার বা ফল সুমিষ্ট— তেমনি সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে। মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের উপর কল্পনার উত্তাপপ্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করে। যে-সকল ভাব, যে-সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে-সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায়, সাহিত্য-ব্যবসায়ীসেগুলিকেভিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রূপবান করিয়াতোলে। যখনি তাহাদিগকেভালোরূপে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে তখনি তাহারা অমর হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমশ সাহিত্য-ব্যবসায়ীর মনে এক দল স্ব-স্ব-প্রধান লোকের পল্লী বসিয়া যায়। তাহার জীবনের একটা ঐক্য থাকে না। সে দেখিতে দেখিতে একেবারে শতধা হইয়া পড়ে।তাহার চিরজীবনপ্রাপ্ত ক্ষুধিত মনোভাবের দলগুলি বিশ্ব-জগতের সর্বত্র আপন হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। সকল বিষয়েই

তাহাদের কৌতূহল। বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশ দিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য তাহাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া বেদনাপাশে বদ্ধ করে। দুঃখকেও তাহারা ক্রীড়ার সঙ্গী করে, মৃত্যুকেও তাহারা পরখ করিয়া দেখিতে চায়। নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহারা স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কোনো শাসন মানিতে চাহে না। একটা দীপে একেবারে অনেকগুলা পলিতা জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত জীবনটা হূহুঃশব্দে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। একটা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলা জীবন্ত বিকাশ বিষম বিরোধ-বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।'

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ম্লান ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে এইরূপ বিচিত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার কি কোনো সুখ নাই?'

আমি কহিলাম, 'সৃজনের একটি বিপুল আনন্দ আছে। কিন্তু কোনো মানুষ তো সমস্ত সময় সৃজনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না— তাহার শক্তির সীমা আছে, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেও হয়। এই জীবনযাত্রায় তাহার বড়ো অসুবিধা। মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার গায়ে কিছুই সয় না। সাত-ফুটা-ওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভালো, ফুৎকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।'

সমীর কহিল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে বংশখণ্ডের মতো মানুষের কার্যবিভাগ নাই। মানুষ-বাঁশিকে বাজিবার সময় বাঁশি হইতে হইবে, আবার পথ চলিবার সময় লাঠি না হইলে চলিবে না। কিন্তু ভাই, তোমাদের তো অবস্থা ভালো, তোমরা কেহ বাঁশি, কেহ বা লাঠি— আর আমি যে কেবলমাত্র ফুৎকার। আমার মধ্যে সংগীতের সমস্ত আভ্যন্তরিক উপকরণই আছে, কেবল যে একটা বাহ্য আকারের মধ্য দিয়া তাহাকে

বিশেষ রাগিণীরূপে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, সেই যন্ত্রটা নাই।'

দীপ্তি কহিলেন, 'মানবজন্মে আমাদের অনেক জিনিস অনর্থক লোকসান হইয়া যায়। কত চিন্তা, কত ভাব, কত ঘটনা প্রবল সুখদুঃখের ঢেউ তুলিয়া আমাকে প্রতিদিন নানারূপে বিচলিত করিয়া যায়; তাহাদিগকে যদি লেখায়বদ্ধ করিয়ারাখিতেপারি তাহা হইলে মনে হয় যেন আমার জীবনের অনেকখানি হাতে রহিল। সুখই হউক, দুঃখই হউক, কাহারও প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ দখল ছাড়িতে আমার মন চায় না।'

ইহার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম স্রোতস্বিনী একটা কী বলিবার জন্য ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, 'কী জানি ভাই, আমার তো আরও ওইটেই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়। প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না। আমাদের অনেক সুখদুঃখ, অনেক রাগদ্বেষ, অকস্মাৎ সামান্য কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়তো অনেক দিন যাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি এক দিন তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে; যাহা আসলে অপরাধ নহে এক দিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে; তুচ্ছ কারণে হয়তো একদিনকার একটা দুঃখ আমার কাছে অনেক মহত্তর দুঃখের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে; কোনো কারণে আমার মন ভালো নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্যের প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছি; তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্যায়, যেটুকু অসত্য তাহা কালক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায়— এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁকিয়া

যায়, সেইটেই আমার প্রকৃত আমারত্ব। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্ধস্ফুট আকারে আসে যায় মিলায়, তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হইয়া যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।'

সহসা স্রোতস্বিনীর চৈতন্য হইল, কথাটা সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া এবং কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে। অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল ; মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল, 'কী জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি না— আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে।'

দীপ্তি কখনো কোনো বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্তত করে না— সে একটা প্রবল উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু অমন ভালো করিয়া বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জন করিতে গেলে ব্যয় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কী হইবে প্রত্যেক তুচ্ছ দ্রব্য মাথায় তুলিয়া, প্রত্যেক ছিন্নখণ্ড পুঁটুলিতে পুরিয়া, জীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া? প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য।'

দীপ্তি মৌখিক হাস্য হাসিয়া করজোড়ে কহিল, 'আমার ঘাট হইয়াছে তোমাকে ডায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কখনো করিব না।'

সমীর বিচলিত হইয়া কহিল, 'অমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম। আমরা মনে করি দোষ স্বীকার করিলে বিচারক দোষ কম করিয়া দেখে। তাহা নহে। অন্য লোককে বিচার করিবার এবং ভর্ৎসনা করিবার সুখ একটা দুর্লভ সুখ ; তুমি নিজের দোষ নিজে যতই বাড়াইয়া বলো-না কেন, কঠিন বিচারক সেটাকে ততই চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব।'

আমি কহিলাম, 'আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে-সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—'

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সমীর করজোড়ে কহিল, 'দোহাই তোমার, সব কথা যদি লেখায় ওঠে তবে বাড়ি হইতে কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে ভুলিয়া যাই তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং পরিশ্রম বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব-ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।'

আমি কহিলাম, 'আরে না, সত্যের অনুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অনুরোধই রাখিব। তোমরা কিছু ভাবিয়ো না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।'

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল, 'সে যে আরো ভয়ানক! আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।'

আমি কহিলাম, 'মুখে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিখিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই বলিয়া রাখিতেছি তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্য করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।'

সর্বসহিষ্ণু ক্ষিতি সন্তুষ্টচিত্তে কহিল, 'তথাস্তু।'

ব্যোম কোনো কথা না বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ হাসিল, তাহার সুগভীর অর্থ আমি এ পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

মাঘ ১২৯৯

সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

বর্ষায় নদী ছাপিয়া ক্ষেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোঠাবাড়ি এবং দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশথ গাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে।

সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ-অংশ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে খেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

স্রোতস্বিনী মনে করিল— নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে। একান্ত কৌতূহল-ভরে বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।

আমি ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কী রে, বাজনা কিসের?'

সে কহিল আজ জমিদারের পুণ্যাহ।

পুণ্যাহ বলিতে বিবাহ বুঝায় না শুনিয়া স্রোতস্বিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে ঐ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটার মধ্যে কোনো এক জায়গায় ময়ূরপংখিতে একটি চন্দনচর্চিত অজাতশ্মশ্রু নববর অথবা লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আমি কহিলাম, 'পুণ্যাহ অর্থে জমিদারি বৎসরের আরম্ভ-দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।

সে টাকা সে দিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনা-দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ— ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ লোভ, অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তরুলতা যেমন আনন্দ-মহোৎসবে বসন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বসন্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায় গণনা করিয়া লয় না, সেইরূপ ভাবটা আর-কি।'

দীপ্তি কহিল, 'কাজটা তো খাজনা আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা-বাদ্য কেন ?'

ক্ষিতি কহিল, 'ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না ? আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।'

আমি কহিলাম, 'সে হিসাবে দেখিতে পারো বটে, কিন্তু বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মতো পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভালো।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমি তো বলি যেটার যাহা সত্য ভাব তাহাই রক্ষা করা ভালো ; অনেক সময়ে নীচ কাজের মধ্যে উচ্চ ভাব আরোপ করিয়া উচ্চ ভাবকে নীচ করা হয়।'

আমি কহিলাম, 'ভাবের সত্যমিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি এক ভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি, আর ঐ জেলে আর এক ভাবে দেখিতেছে ; আমার ভাব যে এক চুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।'

সমীর কহিল, 'অনেকের কাছে ভাবের সত্যমিথ্যা ওজন-দরে পরিমাপ হয়। যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য। সৌন্দর্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, স্নেহের অপেক্ষা স্বার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য।'

আমি কহিলাম, 'কিন্তু তবু চিরকাল মানুষ এই-সমস্ত ওজনে-ভারী মোটা জিনিসকে একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধূলিকে আবৃত করে, স্বার্থকে লজ্জা দেয়, ক্ষুধাকে অন্তরালে নির্বাসিত করিয়া রাখে। মলিনতা পৃথিবীতে বহু কালের আদিম সৃষ্টি, ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন— তাই বলিয়া সেইটেই সব চেয়ে সত্য হইল? আর অন্তর-অন্তঃপুরের যে লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?'

ক্ষিতি কহিল, 'তোমরা ভাই এত ভয় পাইতেছ কেন? আমি তোমাদের সেই অন্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট লাগাইতে আসি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলো দেখি, পুণ্যাহের দিন ঐ বেসুরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কী সংশোধন করা হয়। সংগীতকলা তো নহেই।'

সমীর কহিল, 'ও আর কিছুই নহে, একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে, নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়; হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়; কেনাবেচার উপর ভালোবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকারস্বরে হইতেছে, আর যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে এবং তখনকার মতো সমস্ত চীৎকারস্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের

সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে— পুণ্যাহ সেই সংগীতের দিন।'

আমি কহিলাম, 'উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে এক-এক দিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, এক দিন খরচ করে ; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, এক দিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় ; প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর এক দিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ। সে দিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ— এবং দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর সমস্তই বেসুরা। বুঝিতে পারি, আমরা মানুষে মানুষে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশত তাহা পারিয়া উঠি না ; যে দিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।'

সমীর কহিল, 'সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সে দিক হইতে দেখিতে গেলে মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীন রূপে চক্ষে পড়ে ; মানবাত্মা জিনিসটা যতই উচ্চ হউক-না কেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, এক খণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ও দিকে যে দিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায় সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেমন করিয়াই হোক, প্রতিদিন তাহাকে আহারবিহার কেনাবেচা দরদাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেই হয়— সে জন্য সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস পায়। আহারে-বিহারে আদানে-প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার

আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।'

আমি কহিলাম, 'তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। এক জনের ভূমি, আর-এক জন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে। রাজাপ্রজা ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হৃদয়ের কর্তব্য। খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোনো যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমাদের পুণ্যদিন, আজ আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারি কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ-নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।'

স্রোতস্বিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল, 'আমার বোধ হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ দুঃখভার লাঘব করে। সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনোই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ; বিচ্ছিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা।'

উপমাপ্রয়োগপূর্বক একটা কথা ভালো করিয়া বলিবামাত্র স্রোতস্বিনীর লজ্জা উপস্থিত হয়, যেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের

ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যোম কহিল, 'যেখানে একটা পরাভব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সেখানে মানুষ আপনার হীনতা-দুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মানুষের কাছে বলিয়া নয়, সর্বত্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনি মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।'

ক্ষিতি কহিল, 'মানবাত্মা কোনোমতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যখন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, তখন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাদুঃখ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। পুরুষ যখন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম, তখন অসহায় স্ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে, মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এত দিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।'

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ব্যথিত ভাবে কহিল, 'মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনোরূপে

অভিভূত নহি, বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ, সেখানেও আত্মীয়তা-স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে আমাদের দেশের লোক মা বলিয়া, ভগবতী বলিয়া পূজা করে কেন? সে তো অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে, তাড়না করিলে, তাহার হইয়া দু কথা বলিবার কেহ নাই। আমরা বলিষ্ঠ, সে দুর্বল; আমরা মানুষ, সে পশু। কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তখন যে সেটা বলপূর্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিণী পরম ধৈর্যবতী প্রশান্তা পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান করিয়া যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে; মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, তবেই তাহার সৃজন-চেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।'

ব্যোম গম্ভীর ভাবে কহিল, 'তুমি একটা খুব বড়ো কথা কহিয়াছ।'

শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল। এমন দুষ্কর্ম কখন করিল সে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সলজ্জ সংকুচিত ভাবে সে নীরবে মার্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল, 'ঐ যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ, উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়ষা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারি দিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারি দিকের সহিত আত্মীয়তাবন্ধন-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি, সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য

আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র, আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তু-সমষ্টির মতো এমন পর আর কী আছে। কিন্তু আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল— সে দিন বড়োই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্মাণকার্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারি দিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর পৃথিবীকে আপনার এবং জড় পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি। জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একা মাত্র অবশিষ্ট থাকিব।'

সমীর ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কহিল, 'স্রোতস্বিনী কেবল গাভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে দিন যখন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌদ্রে তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া মাথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিন-পাত্র কূলে নামাইয়া 'মা গো' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মনে বড়ো একটু লাগিল। এই যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে, ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কী আছে! এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ পর্যন্ত যখন স্নেহ-

সজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয়, তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে। তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয় ; জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না ; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম ; পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পূর্বেই আমরা নাড়ির টানে সর্বত্র ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

'আমাদের ভাষায় থ্যাঙ্ক্‌ শব্দের প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কোনো কোনো য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই, জড়ের নিকট হইতে যাহা পাই, তাহাকেও আমরা স্নেহ দয়া উপকার -রূপে জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার যন্ত্রকে কৃতজ্ঞতা-অর্পণ-লালসায় মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না।'

আমি কহিলাম, 'বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা কৃতজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরস্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসংকোচে গ্রহণ করি, অকৃতজ্ঞতা তাহার কারণ নহে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষুক এবং দাতা, অতিথি এবং গৃহস্থ, আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধ যেন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং সে স্থলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।'

ব্যোম কহিল, 'বিলাতি হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। য়ুরোপীয় যখন বলে 'থ্যাঙ্ক্ গড' তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্বরের মতো চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না ; কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের এক প্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ স্নেহের দাবির অন্ত নাই— সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর, মধুরতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

তোমায় মা মা ব'লে আর ডাকিব না,
আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোনো য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জমা হইতে পারে না।'

ক্ষিতি কটাক্ষসহকারে কহিল, 'য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃতজ্ঞতা, তাহারও বোধ হয় একটা গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে কথাগুলি হইল তাহা সম্ভবত অত্যন্ত সুন্দর ; এবং গভীর যে তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ এ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই তো একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি, আর য়ুরোপ তাহার সহিত দূরের লোকের মতো ব্যবহার করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি— যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য, ইংরাজি কাব্য, আমাদের না জানা থাকিত তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সম্ভব হইত? এবং যিনি ইংরাজি কখনো

পড়েন নাই তিনি কি শেষ পর্যন্ত ইহার মর্মগ্রহণ করিতে পারিবেন ?'

আমি কহিলাম, 'না, কখনোই না। তাহার একটু কারণ আছে। প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ এক দিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই ; কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই। কোনো একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষ রূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন ; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

'আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তর-পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখ সম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্য-প্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনি সে আধ্যাত্মিক; কিন্তু যখনি তাহাকে মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতামাত্র। তখনি আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

'ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবী, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না। কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে, আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ, সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য চয়ন করিতে পারিয়াছি, যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মতো সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি, এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার কর-পল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।'

ভাদ্র ১৩০০

সমীর এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে ; ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যাণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশ-বিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যাণ্টনির উচ্চতা সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। লামার্‌মুরের নায়িকা আপনার সকরুণ সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক-না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌বুডের বিষাদঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখো। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনার, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাঁহার পুত্র কোনো কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কী?'

সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন, 'তুমি বঙ্কিমবাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে। মানস-জগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন। কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।'

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না; গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কেন! দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্যেই বিকশিত হয় নাই? এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা, এমন অধ্যবসায় উক্ত উপন্যাসের কয়জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে? আনন্দমঠ তো কার্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ জীবানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনা-মাত্র; যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরানীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব? নহে।'

সমীর কহিলেন, 'ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। শতরঞ্চ-ফলকেই ঠিক লাল কালো রঙের সমান ছক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ তাহা নির্জীব কাষ্ঠমূর্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিধা জিনিস নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহ-কটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্‌ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নব

নব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনা-শাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো তো মানস-প্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড। কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কী ভয়ংকর!'

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্যই স্ত্রীলোকের। কার্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্ধ্বনেত্রে নিশীথ-গগনের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কী সুখ পাইত! কোন্‌ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোনো কার্যে লাগিবে না কোন্‌ নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ-আনন্দ-জনক, কোন্‌ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? ক্ষিতির কথামত পুরুষ যদি যথার্থ কার্য-শীল হইত তবে মনুষ্যসমাজের এমন উন্নতি হইত না— তবে একটি নূতন তত্ত্ব, একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জনের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ— ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জনতার মধ্যে থাকে। কার্যবীর নেপোলিয়ানও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, তিনি সর্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন

করিতেন। ভীষ্ম তো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল? তিনি কি কাজ করিতেছিলেন না ধ্যান করিতেছিলেন? স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝখানে কোনো ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত, জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে; তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।'

দীপ্তি কহিল, 'তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা—কিছুই বুঝিবার জো নাই। মেয়েরা যে কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই।'

ব্যোম কহিলেন, 'স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে; সেই তাহার অন্তঃপুর, তাহার চারি দিকে কোনো অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য কী তেমন দ্রুতবেগে তেমন তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ

দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য !'

আমি কহিলাম, 'আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎ রক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল, 'এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।'

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশি করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভালোবাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'কখনোই না।'

স্রোতস্বিনী মৃদুভাবে কহিল, 'সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড়ো বেশি মধুর।'

স্রোতস্বিনী রমণী হইলেও সত্য কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম, 'তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতিমিষ্টান্নপ্রিয়। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্যতা-পরিমাপের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোনো প্রমাণ নাই। সেইজন্য গায়ক প্রত্যেক বার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেইজন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।'

সমীর কহিলেন, 'কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব,

স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।'

আমি কহিলাম, 'স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দ দান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সংগীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেইজন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। কেবল অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এইজন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড়ো ভয়ানক।'

ক্ষিতি কহিলেন, 'তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল; কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ। বৃহৎ দেশে ও বৃহৎ কালে তাহার স্থান নাই। উপস্থিতমত স্বামীপুত্র আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্য-ক্ষেত্র দূর দেশ ও দূর কালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্তমান কালের নিন্দা-স্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে; সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা লোকস্তুতি সৌভাগ্যগর্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদয় লাভ লোকসান বর্তমানে; হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এইজন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া

আদায় করিতে চায়, এক কানা কড়ি ছাড়িতে চায় না।'

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন, 'বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য করি না বলিয়া আমাদের কার্যের গৌরব অল্প, এ কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী স্নায়ু অস্থিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষ-দেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন ; স্ত্রী-দেবীগণ হৃদয়শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনর্বার নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। যেন ভিখারি না হইয়া, অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখো, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতি দিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ, প্রতি মুহূর্তে কর্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে, প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য। যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী লোকবৎসলা দেবী প্রতি দিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধ স্পর্শ দান করেন, আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্যস্থল সংকীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে ? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।'

ইহার পর আমরা সকলেই কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই

অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কথা কী বলিতেছিলে— মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।'

আমি কহিলাম, 'আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রী-লোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ!'

ক্ষিতি কহিলেন, 'তাহার প্রমাণ?'

আমি কহিলাম, 'প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। প্রমাণ অন্তরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোনো কোনো নদী দেখা যায় যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূ ধূ করিতেছে, কেবল এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে-কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্র-পদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা; এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর, তুমি কী বল?'

সমীর স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া

কহিলেন, 'অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। বিশ্ব-সংসারের মধ্যে বাঙালি পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কী ভাই? ঐ যে আমাদের মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্পগুলি সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব! আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের নির্নিমেষ সন্ধ্যাদীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দিকে অনন্ত অতৃপ্তি-ভরে শতসহস্র বার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম, তবে উহাদেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোটো ছিল, তখন মাটির পুতুল লইয়া এমনি ভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড়ো হইল তখন মানুষ-পুতুল লইয়া এমনি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে। তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না? এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না? যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতি-পত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানব-ভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে। কিন্তু আমরা যে এক-একটি দেবতা, সেই

জন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অসংকোচে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্মাণ করিতে পারিয়াছি।'

দীপ্তি কহিলেন, 'যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে সে মানুষ হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে, এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জ ভাবে আস্ফালন করে; যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি। আজকাল স্ত্রী-দিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত। হায় হায়, বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কী বা দেবতার শ্রী! কী বা দেবতার মাহাত্ম্য!'

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কী? তা ছাড়া, আমাদের তো সকল গুণ নাই—

হৃদয়মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।'

আমি কহিলাম, 'মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে। নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্য কথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবী, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা-কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াই-খানি মাত্র মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের ; এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদ-পীড়ন সহ্য করো— প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।...

'একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহ-বিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালোমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে ; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে স্টীম্‌নৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাই-ভরা গাধা-বোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোকলৌকিকতা আত্মীয়কুটুম্বিতা -পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী-নামক একটি চলৎ-

শক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্য
দেশে পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত
কার্যে বহু কাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি
গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃ-
লালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে
তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই ; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের
হীনতা, দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে।
তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের
সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো
বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য
তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনি ভালোবাসিতে
আরম্ভ করে তখনি তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয় ; তখনি তাহার চিন্তা
বিবেচনা যুক্তি কার্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি, সজাগ হইয়া উঠে ;
তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোনো
রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে
না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।'

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, 'আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা
এবং বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া
বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা
কাঠ জ্বলে না, মরিচা-ধরা চাকা চলে না ; যত জ্বলে তাহার চেয়ে ধোঁয়া
বেশি হয়, যত চলে তাহার চেয়ে শব্দ বেশি করে। আমরা চিরদিন
অকর্মণ্য ভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি,
তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এইজন্য শিক্ষা
তোমরা যত সহজে যত শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারো, আপনার আয়ত্ত

করিতে পারো, তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পারো, আমরা তেমন পারি না।'

স্রোতস্বিনী অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ; তার পর ধীরে ধীরে কহিলেন, 'যদি বুঝিতে পারিতাম আমাদের কিছু করিবার আছে এবং কী উপায়ে কী কর্তব্যসাধন করা যায়, তাহা হইলে আর কিছু না হউক চেষ্টা করিতে পারিতাম।'

আমি কহিলাম, 'আর তো কিছুই করিতে হইবে না। যেমন আছ তেমনি থাকো। লোকে দেখিয়া বুঝিতে পারুক, সত্য, সরলতা, শ্রী যদি মূর্তি গ্রহণ করে তবে তাহাকে কেমন দেখিতে হয়। যে গৃহে লক্ষ্মী আছে সে গৃহে বিশৃঙ্খলতা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই, এইজন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বাড়াবাড়ি—তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে, এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয় ; তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।'

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।

[চৈত্র ১২৯৯]

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী সভা ছাড়িয়া গেলে ক্ষিতি হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, 'এইবার সত্য কথা বলিবার সময় পাইলাম। বাতাসটা এইবার মোহমুক্ত হইবে। তোমাদের কথাটা অত্যুক্তিতে বড়ো, আমি তাহা সহ্য করিয়াছি ; আমার কথাটা লম্বায় যদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সহ্য করিতে হইবে।

'আমাদের সভাপতিমহাশয় সকল বিষয়ের সকল দিক দেখিবার সাধনা করিয়া থাকেন এইরূপ তাঁহার নিজের ধারণা। এই গুণটি যে সদ্‌গুণ আমার তাহাতে সন্দেহ আছে। ওকে বলা যায় বুদ্ধির পেটুকতা। লোভ সম্বরণ করিয়া যেমানুষ বাদসাদ দিয়া বাছিয়া খাইতে জানে সেই যথার্থ খাইতে পারে। আহারে যাহার পক্ষপাতের সংযম আছে সেই করে স্বাদগ্রহণ, এবং ধারণ করে সম্যক্‌রূপে। বুদ্ধির যদি কোনো পক্ষপাত না থাকে, যদি বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশ্রী অভ্যাস তাহার থাকে, তবে সে বেশি পায় কল্পনা করিয়া, আসলে কম পায়।

'যে মানুষের বুদ্ধি সাধারণত অতিরিক্ত পরিমাণে অপক্ষপাতী, সে যখন বিশেষ ক্ষেত্রে পক্ষপাতী হইয়া পড়ে, তখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে, তখন তার সেই অমিতাচারে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। সভাপতিমহাশয়ের একমাত্র পক্ষপাতের বিষয় নারী। সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।

'পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের ভুলচুক ত্রুটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে। বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো সংসারে, সেখানে সহজ বুদ্ধিই কাজ চালাইতে পারে। সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী, তাহার অশিক্ষিতপটুত্ব ; তাই বলিয়াই সে সুশিক্ষিতপটুত্বের উপরে বাহাদুরি লইবে এ তো সহ্য করা চলে না। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে যাহা সহজে সুন্দর তার চেয়ে বড়ো জাতের সুন্দর তাহাই, বৃহৎ সীমায় যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নে যাহা চিহ্নিত, অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতি-সৌষম্যে অতিললিত অতিনিখুঁত নয়।

'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিকভাবে অবিচার করিয়াছ তাহাকে আমি ধিক্কার দিই, তাহার অমিতভাষণেই প্রমাণ হয় তাহার অমূলকতা। পৃথিবীতে কাপুরুষ অনেক আছে, আমাদের দেশে হয়তো বা সংখ্যায় আরো বেশি। তার প্রধান কারণটার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, তাহা দুর্‌মূল্য বলিয়াই দুর্লভ। আদর্শ নারীর উপকরণ-আয়োজন অনেকখানিই জোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ। কিন্তু যাহারা সার্থক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমার মেয়েমহলে মিলিবে কোথায়? অন্তত আমাদের দেশে, এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ নয় মেয়েরাই? তাহাদের অন্ধসংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষা, তাহাদের কৃপণতা! মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্য, প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। এ কথা মনে রাখিয়া দুই জাতের তুলনা করিয়ো।

'স্ত্রৈণকে মনে মনে স্ত্রীলোক পরিহাস করে; জানে সেটা মোহ, সেটা দুর্বলতা। একান্ত মনে আশা করি, দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী তোমাদের বাড়াবাড়ি লইয়া উচ্চহাসি হাসিতেছে; না যদি হাসে তবে তাহাদের 'পরে আমার শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহারা নিজের স্বভাবের সীমা কি নিজেরাও জানে না? পরকে ভোলাইবার জন্য অহংকার মার্জনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে চাপা হাসি হাসা দরকার। নিজেকে ভোলাইবার জন্য যাহারা অপরিমিত অহংকার অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত আত্মসাৎ করিতে পারে তাহারা যদি স্ত্রীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যতা-বোধ নাই— সেটাই হসনীয়, এমন-কি শোচনীয়। স্বর্গের

দেবীরা স্তবের কোনো অতিভাষণে কুণ্ঠিত হন না, আমাদের মর্তের দেবীদেরও যদি সেই গুণটি থাকে তবে তাঁহাদের দেবী উপাধি কেবলমাত্র সেই কারণেই সার্থক।

'তার পরে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তোমাদের আলোচনার ওজন-রক্ষার জন্য বলা দরকার। মেয়েদের ছোটো সংসারে সর্বত্রই অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ এ কথা যদি বলি, তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে। তাহার কারণ, সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌ বলে, তাহার ভালো আছে, মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই-সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ, কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায় সে কথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না? দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি? তুমি বলিবে, সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতিমাত্রায় হৃদয়ালুতা।...

'তোমাদের শিভল্‌রি সাংঘাতিক তেজে উদ্যত হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমরা অনেক কটুভাষা নিক্ষেপ করিবে জানি, কেননা মনে মনে বুঝিয়াছ আমার কথাটা সত্য। সেই গর্ব মনে লইয়া দৌড় মারিলাম; গাড়ি ধরিতে হইবে।'

[চৈত্র ১৩৪২]

পল্লিগ্রামে

আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিসের থানা, ম্যাজিস্‌ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে। যে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপনপ্রচার করে, কোনো একটা প্রস্তরকঠিন পাকা বড়ো রাস্তার দ্বারা তাহার সহিত এই লোকালয়গুলির যোগস্থাপন হয় নাই। কেবল একটি ছোটো নদী আছে। যেন সে কেবল এই কয়খানি গ্রামেরই ঘরের ছেলেমেয়েদের নদী। অন্য কোনো বৃহৎ নদী, সুদূর সমুদ্র, অপরিচিত গ্রামনগরের সহিত যে তাহার যাতায়াত আছে তাহা এখানকার গ্রামের লোকেরা যেন জানিতে পারে নাই, তাই তাহারা অত্যন্ত সুমিষ্ট একটা আদরের নাম দিয়া ইহাকে নিতান্ত আত্মীয় করিয়া লইয়াছে।

এখন ভাদ্রমাসে চতুর্দিক জলমগ্ন— কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। বহু দূরে দূরে এক-একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চ ভূমিতে দ্বীপের মতো দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব, এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বেই ইহাদের বংশের আদিপুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য শয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাকেও ইহারা শিশুর মতো বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মতো নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

এই সমস্ত মানুষগুলির স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোনো একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, স্থির হইয়া নাই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি

লণ্ডন হইতে, প্যারিস হইতে, গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যামসুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একপ্রকার ভালোই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল, যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালোরূপ হৃদয়ঙ্গম হইত না।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে-সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল— থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

কিন্তু লণ্ডন-প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে! কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া দূরে থাক্, দেশ কাহাকে বলে তাহাও ইহারা জানে না।

এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল— তবু এই নির্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালোবাসা নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন-কি, তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয় তবে এ কথা স্বীকার করিব— আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্যটুকু চলিয়া

যায়। কারণ, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।

যতটুকু আহার করা যায় ততটুকু পরিপাক হইলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। মসলা-দেওয়া ঘৃতপক্ক সুস্বাদু চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই, তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না-রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে, যাহা কিছু বিশ্বাস করে, নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের জ্ঞানের সহিত, বিশ্বাসের সহিত, কাজের সহিত, মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণ মনে তাহার সেবা করে। সেজন্য কোনো ক্ষতিকে ক্ষতি, কোনো ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম বলিয়া জানি, কিন্তু তাহাও জ্ঞানে জানি, বিশ্বাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের

চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই-চারি অংশে বিভক্ত করিলেও, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্নপর্যায়গত। তিনের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি।

কিন্তু যেখানে জ্ঞান বিশ্বাস কার্যের বৈচিত্র্য নাই সেখানে এই ঐক্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। ফুলের পক্ষে সুন্দর হওয়া যত সহজ, জীবশরীরের পক্ষে তত নহে। জীবদেহের বিবিধকার্যোপযোগী বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমাবেশের মধ্যে তেমন নিখুঁত সম্পূর্ণতা বড়ো দুর্লভ। জন্তুদের অপেক্ষা মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণতা আরো দুর্লভ। মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটি-কয়েক আদিম পরিবারনীতি গ্রামনীতি এবং প্রজানীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্ত ভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্বিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেই জন্য লণ্ডন-প্যারিসের তুমুল সভ্যতাকোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কানে আসিয়া

স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছু নাই— সে বলের দ্বারা কোনো কাজ করিতে চায় না, এক সময় পৃথিবী তাহারই হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিত ভাবে হরণ করিয়া লইতেছে, এক কালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরানী হইয়া বসিবে। এখনো হয়তো তার অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয়, তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি স্থায়িত্বের উপর ভাবসৌন্দর্যের নির্ভর। পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতানিবন্ধন নহে; হৃদয় বহু-কাল তাহার উপর বাস করিতে পায় বলিয়া সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত করিয়া তাহাকে আপনার সহিত একীকৃত করিতে পারে, সেই কারণেই তাহার মাধুর্য। পুরাতন গৃহ পুরাতন দেবমন্দিরের প্রধান সৌন্দর্যের কারণ এই যে, বহুকালের স্থায়িত্ববশত তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে, তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের সহিত তাহাদের সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে —এই ঐক্যেই তাহাদের সৌন্দর্য। মানবসমাজে স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে সর্বদাই চঞ্চল-ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলই জননী এবং পত্নী -রূপে বিরাজ করিতেছে, কোনো বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই। এই জন্য সমাজের মর্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দর-রূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে। কেবল তাহাই নহে— সেই জন্য সে তাহার ভাবের সহিত, কাজের সহিত, শক্তির সহিত, সবসুদ্ধ এমন

সম্পূর্ণ এক হইয়া গেছে— এই দুর্লভ সর্বাঙ্গীণ ঐক্য লাভ করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অবসর ছিল।

সেইরূপ যখন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করিয়া তর্ক যুক্তি জ্ঞান ক্রমশ সংস্কারে বিশ্বাসে আসিয়া পরিণত হয়, তখনি তাহার সৌন্দর্য ফুটিতে থাকে। তখন সে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিতরে যে সকল জীবনের বীজ থাকে সেইগুলি মানুষের বহু দিনের আনন্দালোকে ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে, এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে ; যন্ত্রতন্ত্র উপকরণসামগ্রীতেও একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।

কিন্তু দেখিতেছি এই সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মানবহৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে, য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ-আনন্দ সরল-শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে। হয় প্রমোদের মাদকতা, নয় নৈরাশ্যের বিলাপ, নয় বিদ্রোহের অট্টহাস্য।

তাহার কারণ, মানবহৃদয় যত ক্ষণ এই বিপুল সভ্যতাস্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিবে তত ক্ষণ কখনোই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। তত ক্ষণ সে কেবল অস্থির অশান্ত হইয়া বেড়াইবে। আর সমস্তই জড়ো হইয়াছে, কেবল এখনো স্থায়ী সৌন্দর্য, এখনো নবসভ্যতার রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়ান নাই। জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য পরস্পরকে কেবলই পীড়ন করিতেছে —ঐক্যলাভের জন্য নহে, জয়লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

কেবল যে প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে সৌন্দর্য তাহা নহে, নবীন আশার

মধ্যেও সৌন্দর্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নাই। বৃদ্ধ য়ুরোপ অনেক বার অনেক আশায় প্রতারিত হইয়াছে; যে সকল উপায়ের উপর তাহার বড়ো বিশ্বাস ছিল সে সমস্ত একে একে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছে। ফরাসি বিপ্লবকে একটা বৃহৎ চেষ্টার বৃথা পরিণাম বলিয়া অনেকে মনে করে। এক সময় লোকে মনে করিয়াছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে—এখন সকলে ভোট দিতেছে, অথচ অধিকাংশ অমঙ্গল বিদায় লইবার জন্য কোনোরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছে না। কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল স্টেটের দ্বারা মানুষের সকল দুর্দশা মোচন হইতে পারে; এখন আবার পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করিতেছেন স্টেটের দ্বারা দুর্দশামোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। কয়লার খনি, কাপড়ের কল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর কাহারও কাহারও কিছু কিছু বিশ্বাস হয়, কিন্তু তাহাতেও দ্বিধা ঘোচে না; অনেক বড়ো বড়ো লোক বলিতেছেন কলের দ্বারা মানুষের পূর্ণতা-সাধন হয় না। আধুনিক য়ুরোপ বলে, 'আশা করিয়ো না, বিশ্বাস করিয়ো না, কেবল পরীক্ষা করো।'

নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে; তাহার সমৃদ্ধি আছে কিন্তু যৌবন নাই, সে আপনার সহস্র পূর্ব-অভিজ্ঞতার দ্বারা জীর্ণ। উভয়ের মধ্যে ভালোরূপ প্রণয় হইতেছে না, গৃহের মধ্যে কেবল অশান্তি।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমি এই পল্লির ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য দ্বিগুণ আনন্দে সম্ভোগ করিতেছি।

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্যাদা বুঝি না। প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই ঐক্যের পূর্ণ আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে

ঐক্যই সৌন্দর্যের প্রধান কারণ। সম্প্রতি য়ুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়াছে; তাই বিচ্ছেদ, বৈষম্য। যখন ঐক্যের যুগ আসিবে তখন এই বৃহৎ স্তূপের মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া, পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, একখানি সমগ্র সুন্দর সভ্যতা দাঁড়াইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য ও নির্ভয়তা আছে সন্দেহ নাই— আর, যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে; বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়; কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। এই বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। উভয়ের বিচ্ছেদে অর্ধসভ্যতা। তথাপি আমরা সাহস করিয়া য়ুরোপকে অর্ধসভ্য বলি না, বলিলেও কাহারও গায়ে বাজে না। য়ুরোপ আমাদিগকে অর্ধসভ্য বলে; এবং বলিলে আমাদের গায়ে বাজে, কারণ, সে আমাদের কর্ণধার হইয়া বসিয়াছে।

আমি এই পল্লিপ্রান্তে বসিয়া আমার সাধাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর স্বরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি 'তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না', এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয়, 'তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুনঃ ঝংকারকেও পরিপূর্ণ সংগীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্য হইতে মহৎ মূর্তিমান সংগীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।'

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল, 'এ সব তুমি কী লিখিয়াছ! আমি যে সকল কথা কস্মিন কালে বলি নাই, তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?'

আমি কহিলাম, 'তাহাতে দোষ কী হইয়াছে?'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'এমন করিয়া আমি কখনো কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।'

আমি কহিলাম, 'তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কী করিয়া বুঝিবে? তুমি যতটা বল তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলি তো বাদ দিতে পারি না।'

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না বুঝিল কি না-বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম, 'তুমি জীবন্ত বর্তমান, প্রতি ক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ। তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোনো চেষ্টাই করিতে হইতেছে না। কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্যব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি, তাহা ঠিক নহে। আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি; তোমার লক্ষ লক্ষ কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতের

কেবলমাত্র সার-সংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ, ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারও কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না ; লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।'

স্রোতস্বিনী দক্ষিণপার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, 'তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাস্তবিক ততখানি নহি।'

আমি কহিলাম, 'আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব। একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে? ঈশ্বরের মতো কাহার স্নেহ?'

ক্ষিতি তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল; কহিল, 'এ আবার তুমি কী কথা তুলিলে! স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর এক ভাবে তাহার উত্তর দিলে!'

আমি কহিলাম, 'জানি। কিন্তু কথাবার্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর-প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন এক প্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশ হাত দূরে আর এক জায়গায় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়; আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসবসভা, সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 'আসুন মশায় বসুন' বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।'

ক্ষিতি কহিল, 'ঘাট হইয়াছে, তবে তাই করো— কী বলিতেছিলে বলো। ক-উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে,তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না। একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা

উত্তর তোমার মনে ওঠে, তবে তো কোনো কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদজাতীয় লোককে নিজের খেয়াল-অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভালো, যাহা মনে আসে বলো।'

আমি কহিলাম, 'আমি বলিতেছিলাম যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন-কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল— সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।'

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল, কী সর্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে; কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে, তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজে আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই; লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম, বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত

লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।'

ক্ষিতি কহিল, 'সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত, এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।'

আমি কহিলাম, 'ভাষা ভূমির মতো। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অনন্ত এবং অসীম শব্দদুটা আজকাল সর্বদা-ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য যথার্থ একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও দুটা শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্তব্য।'

ক্ষিতি কহিল, 'ভাষার প্রতি তোমার তো যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।'

সমীর এত ক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল; শেষ করিয়া কহিল, 'এ কী করিয়াছ! তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত! ইহারা দেখিতেছি কেবল বড়ো বড়ো ভালো ভালো কথাই বলে, কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল!'

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম, 'কেন বলো দেখি।'

সমীর কহিল, 'তুমি মনে করিয়াছ আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো, তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়— কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহাতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই-চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি

না। আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।'

আমি কহিলাম, 'সে জন্য কী করিতে হইবে?'

সমীর কহিল, 'সে আমি কী জানি। আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলো মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না; আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই ভ্রমসংকুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্‌ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বহি নই, আমি তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই— আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই।'

ব্যোম এত ক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর একটা চৌকির উপর পা-দুটা তুলিয়া অটল প্রশান্ত ভাবে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিল, 'তর্ক বলো, তত্ত্ব বলো, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ, অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষেপ করিবে? গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভালো ভালো পাকা কথাগুলি যদি অতি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও, তবে ভ্রম হয় তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই, তাহার যত দূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাতত দারিদ্র্যের মতো দেখিতে হয়, কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি, একটা জীবন নির্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের

কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা-দুর্বলতা-টুকু না রাখিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোটো করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচীপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।'

সমীর কহিল, 'মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প; এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়— কেবল রথ নহে, রথের মধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়। যদি একটা মানুষকে উপস্থিত কর তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না; তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থানপরিবর্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাপ্ত ভাবেই দেখাইতে হইবে।'

আমি কহিলাম, 'সেইটাই তো কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গিটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেক বার ভাবিয়াছি, ভালো বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল -অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।'

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল, 'সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ না ভঙ্গিটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন। দেহটা বর্তমানেই সমাপ্ত; জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে,

তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ ; যতটুকু ভঙ্গির দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন— তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি, তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।'

সমীর কহিল, 'সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'আমার মনে হয় মানুষের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক-এক জন মানুষ এমন একটি মনের আকৃতি লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।'

দীপ্তি কহিল, 'মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের স্টাইল। সেইটের দ্বারাই আমরা পরস্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি এক-এক বার ভাবি আমার স্টাইলটা কী রকমের। সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাহা নহে—'

সমীর কহিল, 'কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতির কথা কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।'

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, অতএব অনুরোধ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। কোনো চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোনো চেহারায় বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই প্রকাশমান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য

তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না। কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকটুকু বাহির হয়। আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মুখে এ বিলাপ শোভা পায় না যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা —নূতন আনন্দ। সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ-বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির হয় তবে সেই জন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; কারণ, তাহাই-বা কয় জন লোকের আছে এবং কয় জন বাহির করিয়া দিতে পারে!'

সমীর হাস্যমুখে কহিল, 'মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ এমন দীনতা আমি কখনো স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরির প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে, পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না; মনে হইত যথার্থ মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে, কিন্তু 'ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিনলি না'। ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে এক বার প্রবেশ করিয়া দেখ্‌, এই মানবহৃদয়ের ভিড়ের মধ্যে। সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না সেখানে তাহারা কথা কহিবে; লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে; পৃথিবীতে

যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন মহাকাব্যের নায়ক— কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্ নবদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে?'

আমি কহিলাম, 'না করিলে কী এমন আসে যায়? মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালোবাসে কী করিয়া? একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহু দূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরিগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না— সে এত সামান্য লোক ছিল। এক দিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে 'পিসিমা' 'পিসিমা' করিয়া কাতর স্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই-যে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া, ঈষৎ গ্রাবা হেলাইয়া, কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া, এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যত ক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্‌ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত, তত ক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটিরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? এক দিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সে দিন কি সকালের

চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গলবার্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণা কাতরতা উদ্‌বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম এই তুচ্ছ লোকটিকে যদি কোনো মতে বাঁচাইতে পারি তবে এক বৃহৎ কাজ করা হয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিলাম, কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলাম না— আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোনো কবি অনুমান করে নাই, কোনো পাঠক স্বীকার করে নাই— তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না, একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোষাক-সমেত লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারো মাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে, আর আমাদের মতো দীপ্তিহীন ছোটো ছোটো লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়; পিসিমার ভালোবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায়— মানুষে পরিপূর্ণ।'

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল, 'তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানি বেহারা নিহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশু-

সন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। এখন সে কাজকর্ম করে, দুপুর বেলা বসিয়া পাখা টানে— কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে! তাহাকে যখনি দেখি কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে— আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।'

আমি কহিলাম, 'তাহার কারণ, উহার যে ব্যথা সমস্ত মানবের সেই ব্যথা। সমস্ত মানুষই ভালোবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্ণ মুখে সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'কেবল তাহাই নয়। মনে হয় পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে। কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনো কালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালোবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়! যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে, ছেলেদুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না— জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যত বড়ো দুর্ঘটনাই ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতে হইবে, কোনো ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না— যখন ভাবিয়া দেখি এমন অংসখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখকষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত— যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না— তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই

অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসেএবং ভালোবাসার যোগ্য। আমার মনে হয় যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন-কি নিজেকেও ভালোরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখ দুঃখ বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।'

ক্ষিতি কহিল, 'পূর্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল; যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী, সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এখন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন অকৃতী অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার কাব্য-উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূক জাতির ভাষা, এই সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।'

সমীর কহিল, 'নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপ-ত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।'

বৈশাখ ১৩০০

এই যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়গাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি ; টিক্‌টিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্ করিতেছে ; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্‌শব্দে মহাব্যস্ত ভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে ; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে —এই তো বেশ আছি। মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী? কাগজ কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল ? কোন্ বিষয়ে তোমার কী মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি, সে কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল ? ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণাবাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুকনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারী! গোটাকতক খড়কুটা ধূলাবালি, সুবিধামত যাহা হাতের কাছে আসে, তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গি

করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল! এমন করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক— না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ— পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া, সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া, লাঠিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক— তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খেপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ। কেবল একটা কঠিন কীর্তি। তাহাকে কেহ-বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ-বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনি থাক্‌।

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই! সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে— এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও, সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি, ঐ একটি লোক রৌদ্রনিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণহস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণসিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত, উপযুক্তসারপ্রাপ্ত পর্যাপ্তপল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ-বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আস্ত গাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণসিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণসিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আস্ত গাছটির মাঝখানে কেবল একটি-ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই-চারি দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচি পাতায় পুলকিত হইয়া উঠে? ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা ভরিয়া যায়? তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, 'আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন? পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে

দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে, সে গাছের কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যত ক্ষণ না স্থির হইবে তত ক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া, দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যত ক্ষণ মীমাংসা না হয় তত ক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলক-সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে সেদিন ইচ্ছা করে— কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!'

এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ দিক, না হয় ও দিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয় একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আরণ্য সমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া, শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া

পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না !

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই ! ভাগ্যে ধুতুরা গাছ কামিনী গাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না 'তোমার ফুলের মধ্যে কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই', এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই'। কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি', এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না !

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া, তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই

সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে এক ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর এক ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনো কালে কিছুতেই বোঝা যায় না অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন-কি এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণসিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ অসুখ অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে, কিন্তু যখন-তখন ঊনপঞ্চাশবায়ুবেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না। এক-আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা হাওয়া উহার মানস-আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

দীপ্তি কহিল, 'সত্য কথা বলিতেছি, আমার তো মনে হয়, আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।'

আমি কহিলাম, 'দেবী, আর কাহারও স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না ?'

দীপ্তি কহিল, 'যখন স্তব ছাড়া আর বেশি কিছু পাওয়া যায় না, তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।'

সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল, 'ভগবতী, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তবগান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারি।'

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল, 'অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।'

সমীর কহিল, 'এত বড়ো ভুলটা বুঝিলে, কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভূতসভার বর্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথবাবু তাঁর ডায়ারিতে মন-নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নীচেই গুটিকতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি— আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।'

ক্ষিতি করজোড়ে কহিল, 'দেখো ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক—তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে, আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোনো পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না। যেন খাপের সহিত তরবারি মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্মের মধ্যে সেই প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়,

তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহর -রূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক, অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর যেন আর জন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি।'

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল; কহিল, 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন। তাহার উপরে প্রবন্ধ-বন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়— গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্।'

দীপ্তি কহিল, 'হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।'

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুকলাভ করিল। হাসিতেহাসিতেকহিল 'বড়ো চমৎকার বলিয়াছ। আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'তোমরা সমীরের লেখাটা আজ আর শুনিতে দিবে না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়ো, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়ো না।'

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন-কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেল্‌ফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ নিরুপায়ের মতো সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল, 'মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়, এই জন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদা খিট্‌খিট্ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন এক জন বাহিরের লোক ঘরের

হইয়া পড়িয়াছে— তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালো-বাসাও দুঃসাধ্য।

'সে যেন অনেকটা বাঙালির দেশে ইংরাজের গবর্মেণ্টের মতো। আমাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের আইন। উপকার করে, কিন্তু আত্মীয় মনে করে না। সেও আমাদের বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যে সকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ছিল তাহার শিক্ষায় সেগুলি নষ্ট হইয়া গেছে, এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য-ব্যতীত আর চলে না।

'ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরো কতকগুলি মিল আছে। এত কাল সে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে তবু সে বাসিন্দা হইল না, তবু সে সর্বদা উড়ু-উড়ু করে। যেন কোনো সুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই, মহাসমুদ্রপারে তাহার জন্মভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য এই যে, তুমি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই 'যো হুজুর খোদাবন্দ্' বলিয়া হাত জোড় করিবে, ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে; আর তুমি যদি ফস্ করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি উঁচাইতে পারো, খৃস্টান শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চড়টির পরিবর্তে চাপড়টি প্রয়োগ করিতে পারো, তবে সে জল হইয়া যাইবে।

'মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই সুগভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতিসতর্কভাবে কাজ করে, তাহাকে আমরা ভালোবাসি না; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদা নিশ্চিন্ত-

অম্লান-বদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে এবং অবলীলাক্রমে বেয়াড়া কাজ করিয়া ফেলে, লোকে তাহাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে ঋণের আবশ্যক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে অপরাধী করে ; আর, যে নির্বোধ নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনামাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বসে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং সকল সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাখে না। অনেক সময় অবিবেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনস্বী হিতাহিতজ্ঞানের অনুদেশ-ক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে, তাহাকে লোকে হিসাবি, বিষয়ী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।

'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। নেশা করিয়া বরং পশুর মতো হইয়া যাই, নিজের সর্বনাশ করি, সেও স্বীকার, তবু কিছু ক্ষণের জন্য খানার মধ্যে পড়িয়াও সে উল্লাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত এবং আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিত, তবে কি এমন উপকারী লোকটার প্রতি এতটা দূর অকৃতজ্ঞতার উদয় হইত ?

'বুদ্ধির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই ? বুদ্ধি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত ; আর প্রতিভা কালে-ভদ্রে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয় ; আর

প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মতো আসে, কাহারও আহ্বানও মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে।

'প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই, এই জন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতরে আর একটা নাই। আর্‌-সোলার স্কন্ধে কাঁচপোকা বসিয়া তাহাকে শুষিয়া খাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্যন্ত তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে না।

'সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন। তাহার অসীম নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অবহেলে একটা দুর্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মতো সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনো আদর করে, কখনো আঘাত করে; কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মতো গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জন করে।

'চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড়ো একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি প্রভুভক্তি তাহার একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে পারে তাহার জন্য যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্তমান যুগের নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্য এত লোক স্বেচ্ছাপূর্বক আত্ম-বিসর্জনে উদ্যত হয় না।

'যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন, কী ভাবিয়া, কী যুক্তি অনুসারে কী কাজ করিতেছে

তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না ; এবং মানুষ নিজের সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্ত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতা হইয়া ঝাঁপ দেয়।

'রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি। এই জন্য তাহার গতিবিধি আচার-ব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এই জন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী 'মরণং ধ্রুবং'।

'প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি, তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার-আলোচনা কেন-কিবৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারি হস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, 'তুমি মহামায়া, তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি।' '

সমীর হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটু থামিবামাত্র ক্ষিতি গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল, 'বাঃ! চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইয়া বলিতেছি, এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি তুমি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মতো আমার মধ্যেও সে জিনিসটার অভাব আছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে প্রতিভার জন্যও কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

দীপ্তি সমীরকে কহিল, 'তুমি যে মুসলমানের মতো কথা কহিলে, তাহাদের শাস্ত্রেই তো বলে মেয়েদের আত্মা নাই।'

স্রোতস্বিনী চিন্তান্বিত ভাবে কহিল, 'মন এবং বুদ্ধি শব্দটা যদি তুমি একই অর্থে ব্যবহার কর আর যদি বল, আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত,

তবে তোমার সহিত আমার মতের মিল হইল না।'

সমীর কহিল, 'আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যোগ্য নহে। প্রথম বর্ষায় পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে দুই-তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যখন তাহার উপর মাটি পড়িবে তখন সে কর্ষণ সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কথাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয়তো দ্বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙিতেও পারে, অথবা পলি পড়িয়া উর্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক, আসামির সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।—

'মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চল ভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে, ত্যাগ করিতেছে, গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস-আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতন ভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

'এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল সৌন্দর্য ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যত স্থির ও নিষ্ক্রিয়; কিন্তু ইহার ভিতরে একটি

অনায়াসনৈপুণ্য, একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগূঢ় ভাবে কাজ করিতেছে। সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং দুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং ডুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণী-শক্তি নাই, সে কিছুই জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না।

'রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি, আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

'এই স্থিতি এবং গতি, সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ উপার্জন জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এই জন্য তাহার এমন সহজ বুদ্ধি, সহজ শোভা, অশিক্ষিতপটুতা। মনুষ্যসমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এই জন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজসাধ্যের মতো হইয়া চলিতেছে। পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্য ভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

'পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সংগীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোল ভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা কর না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি সুগোল সম্পূর্ণ গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত আপনার পরিধি বিস্তার করে, সেই জন্য হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দর ভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।

'এই যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণশক্তি।

ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।'

ব্যোম অধীরের মতো হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল, 'তুমি যাহাকে ঐক্য বলিতেছ আমি তাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে। আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেই জন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

'ইংরাজের সহিত সমীর মনের যে তুলনা করিয়াছেন এখানেও তাহা খাটে। ইংরাজ সকল জিনিসকেই অগ্রসর হইয়া তাড়াইয়া খেদাইয়া ধরে। তাহার 'আশাবধিং কো গতঃ', শুনিয়াছি সূর্যদেবও নহেন— তিনি তাহার রাজ্যে উদয় হইয়া এ পর্যন্ত অস্ত হইতে পারিলেন না। আর আমরা আত্মার ন্যায় কেন্দ্রগত হইয়া আছি; কিছু হরণ করিতে চাহি না, চতুর্দিকে যাহা আছে তাহাকে ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে চাই। এই জন্য আমাদের সমাজের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে, এমন একটা রচনার নিবিড়তা দেখিতে পাওয়া যায়। আহরণ করে মন, আর সৃজন করে আত্মা।

'যোগের সকল তথ্য জানি না; কিন্তু শুনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা-বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্ধ-অচেতন ভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া, পঞ্জিত করিয়া, জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।

'বড়ো বড়ো লোকেরা যে বড়ো বড়ো কাজ করেন, সেও এই ভাবে। যেখানকার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া

রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কার্যরূপে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্বকনিষ্ঠজাত মন-নামক দুরন্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর প্রতিভার অমোঘ মায়ামন্ত্রবলে মুগ্ধের মতো কাজ করিয়া যায়; মনে হয় সমস্তই যেন জাদুতে হইতেছে; যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থাগুলিও, যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে —গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙাচোরা ইটালিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন— ওয়াশিংটন অরণ্যপর্বতবিক্ষিপ্ত আমেরিকাকে আপনার চারি দিকে টানিয়া আনিয়া একটি সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

'এই সমস্ত কার্য এক-একটি যোগসাধন।

'কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক-একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতন ভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগ্নী অতিথি-অভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারি দিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে; বিচিত্র উপাদান লইয়া বড়ো সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্মাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে যায় আপনার চারি দিককে একটি সৌন্দর্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিতকে একটি অনির্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ; মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই যে ঠিক সুরটি ঠিক জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়, ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিলজগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন

নাম দেওয়া উচিত।

'প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।'

অতঃপর ব্যোম সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'তার পরে? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেলো।'

সমীর কহিল, 'আর আবশ্যক কী? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি, তুমি তো তাহার এক প্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।'

ক্ষিতি কহিল, 'কবিরাজ মহাশয় শুরু করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহাশয় সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদায় হই। মন কী, বুদ্ধি কী, আত্মা কী, সৌন্দর্য কী এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ সকল তত্ত্ব কস্মিন্ কালে বুঝি নাই কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল; আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।'

পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুখে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া যেন তেমনি ভাবে মনে মনে কথাগুলিকে বহু যত্নে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল; সমীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী ভাবিতেছ।'

দীপ্তি কহিল, 'বাঙালির মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙালির ছেলেদের মতো এমন অপরূপ সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাই ভাবিতেছি।'

আমি কহিলাম, 'মাটির গুণে সকল সময়ে শিব গড়িতে কৃতকার্য হওয়া যায় না।'

শ্রাবণ ১৩০০

আমি বলিতেছিলাম, 'বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু কিসের স্মৃতি তাহার কোনো ঠিকানা নাই। যাহার কোনো নির্দিষ্ট আকার নাই তাহাকে এত দেশ থাকিতে স্মৃতিই বা কেন বলিব, বিস্মৃতিই বা না বলিব কেন— তাহার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বিস্মৃতি জাগিয়া ওঠে' এমন একটা কথা ব্যবহার করিলে শুনিতে বড়ো অসংগত বোধ হয়। অথচ কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। অতীত জীবনের যে সকল শতসহস্র স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতন মহাদেশের চতুর্দিক বেষ্টনকরিয়া যাহারা বিস্মৃতিমহাসাগর-রূপে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা কোনো কোনো সময়ে চন্দ্রোদয়ে অথবা দক্ষিণের বায়ু-বেগে একসঙ্গে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতন হৃদয় সেই বিস্মৃতিতরঙ্গের আঘাত-অভিঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহাবিস্মৃত অতিবিস্তৃত বিপুলতার একতান ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।'

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, 'ভ্রাতঃ, করিতেছ কী! এই বেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছন্দে শুনিতেই ভালো লাগে, তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গদ্যের মধ্যে যদি তোমরা পাঁচ জনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাক, তবে তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠে। বরং দুধে জল মিশাইলে চলে, কিন্তু জলে দুধ মিশাইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমাদের মতো গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।'

বাস্! মনের কথা আর নহে। আমার শরৎপ্রভাতের নবীন ভাবাঙ্কুরটি প্রিয়বন্ধু ক্ষিতি তাঁহার তীক্ষ্ণ নিড়ানির একটি খোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়োই দুর্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে 'কী পাগলামি করিতেছ', তবে কোনো যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই জন্য ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতে পায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন— সুধীগণ মরালের মতো নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন। নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করিতেন। কখনো বা ভবভূতির ন্যায় সুমহৎ দম্ভের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মানিকের এক দর সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন, 'হে চতুর্মুখ, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু অরসিকের কাছে রসের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না।'

বাস্তবিক, এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অরসিক না থাকুক, এত বড়ো প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ তাহা হইলে জগতের জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। অরসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র

নীরব, সমালোচনার কোটা একেবারে শূন্য— এ জন্য, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু ঘানিযন্ত্রে সর্ষপ ফেলিলে অজস্রধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধুর প্রত্যাশা করিতে পারে না— অতএব হে চতুর্মুখ, ঘানিকে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিয়ো, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণীজনের হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়ো না।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্বদাই আর্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন, 'কেন, গদ্যে পদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ?'

আমি কহিলাম, 'পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু যদি কোনো রূঢ়স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোনো অস্ত্র নাই। এই জন্য অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। পদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোনো ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়।'

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, 'আমি ঐক্যবাদী। একা গদ্যের দ্বারাই আমাদের সকল আবশ্যক সুসম্পন্ন হইতে পারিত, মাঝে হইতে পদ্য আসিয়া মানুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে; কবি-নামক একটা স্বতন্ত্র

জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে যখন সাধারণের সম্পত্তি অর্পিত হয়, তখন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দিকে কঠিন বাধা নির্মাণ করিয়া কবিত্ব-নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। কৌশলবিমুগ্ধ জনসাধারণ বিস্ময় রাখিবার স্থান পায় না। এমনি তাহাদের অভ্যাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, ছন্দ ও মিল আসিয়া ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈতন্য হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাবকে পাঁচরঙা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেই জন্য সে হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়— আমি তাহাকে দু চক্ষে দেখিতে পারি না।'

এই বলিয়া ব্যোম পুনর্বার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, 'বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম কেবল জন্তুদের মধ্যে নহে, মানুষের রচনার মধ্যেও খাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কবিতার পেখমও সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে। অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে কবিত্ব স্বভাবতই ছন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই?'

শ্রীযুক্ত সমীর এত ক্ষণ মৃদুহাস্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। দীপ্তি যখন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'কৃত্রিমতাই মনুষ্যের

সর্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কাহারও কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্মাণ করিতে হয় না, ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপনার সৃজনকার্যের অ্যাপ্রেন্টিস্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটোখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে সে তত আদর পাইয়াছে। পদ্য গদ্য অপেক্ষা অধিক কৃত্রিম বটে ; তাহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশি আছে ; তাহাতে বেশি রঙ ফলাইতে হইয়াছে, বেশি যত্ন করিতে হইয়াছে। আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশচেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক আছে। সেই তাঁহার প্রধান গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।'

স্রোতস্বিনী অবহিত ছাত্রীর মতো সমীরের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার সুন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নূতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্য দিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্তত করিতেন, আজ সেরূপ না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন, 'সমীরের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে, আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। সৃষ্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ— অর্থাৎ, সৃষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞান সঞ্চার করে না, হৃদয়ে ভাব সঞ্চার করে, যেমন ফুলের সৌন্দর্য, পর্বতের মহত্ত্ব— সেই অংশে কতই নৈপুণ্য খেলাইতে হইয়াছে, কতই রঙ ফলাইতে, কত আয়োজন করিতে হইয়াছে। ফুলের প্রত্যেক

পাপড়িটিকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে, তাহাকে বৃন্তের উপর কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, পর্বতের মাথায় চিরতুষারমুকুট পরাইয়া তাহাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমার সহিত আসীন করা হইয়াছে, পশ্চিমসমুদ্রতীরের সূর্যাস্তপটের উপর কত রঙের কত তূলি পড়িয়াছে! ভূতল হইতে নভস্তল পর্যন্ত কত সাজসজ্জা, কত রঙচঙ, কত ভাবভঙ্গী, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষের মন ভুলিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম সৌন্দর্য মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকেও গুণপণা দেখাইতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ, বর্ণ এবং গন্ধ বহু যত্নে বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন তাহাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করিতে তাঁহাকে যে কেমন সুনির্দিষ্ট সুসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাব প্রকাশ করিতে মানুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের মধ্যে সংগীত আনিতে হয়, ছন্দ আনিতে হয়, সৌন্দর্য আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। ইহাকে যদি কৃত্রিমতা বলে, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম।'

এই বলিয়া স্রোতস্বিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন সাহায্য প্রার্থনা করিল; তাহার চোখের ভাবটা এই, 'আমি কী কতকগুলা বকিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই, তুমি ঐটেকে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলো না।'

এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম এমন মতও আছে। স্রোতস্বিনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য শব্দ গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ

আমাদের মনের কৃত্রিম রচনা, এ কথা অপ্রমাণ করা বড়ো কঠিন।'

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোনো আবশ্যক আছে কি না। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব লয়তত্ত্ব মায়াবাদ প্রভৃতি চোরা-বালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার বিশ্বাস ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোটো ছেলেরা যেমন ছড়া ভালোবাসে তাহার ভাবমাধুর্যের জন্য নহে, কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝংকারমাত্রই কানে ভালো লাগিত। এই জন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে ততই ছন্দের সঙ্গে অর্থ সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই-একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।'

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন, 'ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে না। মানুষের নাবালক-অংশটিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই, তাহারই কল্যাণে জগতে যা কিছু মিষ্টত্ব আছে।'

সমীর কহিলেন, 'যে ব্যক্তি একেবারে পুরোপুরি পাকিয়া গিয়াছে সেই জগতের জ্যাঠা ছেলে। কোনো রকমের খেলা, কোনো রকমের ছেলেমানুষি তাহার পছন্দসই নহে। আমাদের আধুনিক হিন্দুজাতটা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যন্ত বেশি মাত্রায় পাকামি করিয়া থাকে, অথচ নানান বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা

জাতির উন্নতি হওয়া বড়ো দুরূহ ; কারণ, তাহার মনের মধ্যে নম্রতা নাই। আমার এ কথাটা প্রাইভেট। কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের মেজাজ ভালো নয়।'

আমি কহিলাম, 'যখন কলের জাঁতা চালাইয়া শহরের রাস্তা মেরামত হয় তখন কাষ্ঠফলকে লেখা থাকে, কল চলিতেছে! সাবধান! আমি ক্ষিতিকে পূর্বে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমি কল চালাইব। বাষ্পযানকে তিনি সর্বাপেক্ষা ভয় করেন, কিন্তু সেই কল্পনাবাষ্প-যোগে গতিবিধিই আমার সহজসাধ্য বোধ হয়। গদ্যপদ্যের প্রসঙ্গে আমি আর একবার শিবের গান গাহিব। ইচ্ছা হয় শোনো।—

'গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে ; এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবী এক মহাছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—'

ব্যোমচন্দ্র অকস্মাৎ আমাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'স্থিতিই যথার্থ স্বাধীন, সে আপনার অটল গাম্ভীর্যে বিরাজ করে, কিন্তু গতিকে প্রতি পদে আপনাকে নিয়মে বাঁধিয়া চলিতে হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা অনুসারে চলাকেই মূঢ় লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল ; এই জন্য মুক্তি অর্থাৎ চরম স্থিতি লাভ করিতে হইলে ঐ ইচ্ছাটাকে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান

দেন। দেহমনের সর্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।'

সমীর ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্যে কহিলেন, 'একটা মানুষ যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তখন মাঝখানে তাহার গতি-রোধ করার নাম গোলযোগ-সাধন।'

আমি কহিলাম, 'বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারী একটা কুটুম্বিতা আছে। সা স্বরের তার বাজিয়া উঠিলে মা স্বরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোকতরঙ্গ উত্তাপতরঙ্গ ধ্বনিতরঙ্গ স্নায়ুতরঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এই জন্য বিশ্ব-সংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ুদোলায় দোল দিয়া যায়, আলোকরশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ুতন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি-আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছন্দে নানা সূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

'হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা স্বরের মিল আছে।

'এই জন্য সংগীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

'কারণ, সংগীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত

অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। আমিও কখনো কখনো এমনতরো ভাব অনুভব করিয়াছি এবং এমনতরো ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সংগীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্যাস্তচ্ছটাও কত বার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে— যে একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সংগীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতি দিনের সুখদুঃখের কোনো যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সংগীত এবং সূর্যাস্ত কেন, যখন কোনো প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

‘এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত এক তালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত এক দলে মিশিয়া অনিবার্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

‘এই ভাবকে কবিরা কত ভাষায় কত উপায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই—

মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

‘কারণ, ভাষার তো হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস-মহলে তাহার অধিকার নাই, আম-দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সংগীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

‘এই জন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে, তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে। দূরে যখন বাঁশি বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। সৌন্দর্য যেমন মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

‘সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সংগীতের দুই অংশ। গ্রীকরা ‘জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সংগীত’ বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, শেক্স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির সঙ্গে আর একটা গতির বড়ো নিকট সম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহাসংগীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সংগীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়। যদি কৃত্রিম কিছু হয় তো ভাষাই

কৃত্রিম, সৌন্দর্য কৃত্রিম নহে। ভাষা মানুষের, সৌন্দর্য সমস্ত জগতের এবং জগতের সৃষ্টিকর্তার।'

শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিলেন, 'নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সংগীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া, নানা কার্য-রূপে প্রবাহিত হইয়া চলে— আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুত বেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়স্থলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়— বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।'

ফাল্গুন ১২৯৯

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, 'কচ-দেবযানী-সংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।'

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব অনুভব করিলাম; কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন, তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোনো তাৎপর্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।— ও লেখাটা ভালো হয় নাই।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম; মনে মনে কহিলাম, আর একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না; কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্বতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, 'যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে। অপর পক্ষে, সমালোচক-সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মতো হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য, হয়তো তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।'

দীপ্তি গম্ভীরমুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন, 'তা হইবে।'

বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশতলবর্তী কোনো এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

'যদি তাৎপর্যের কথা বলো, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছি।'

ক্ষিতি কহিল, 'আগে বিষয়টা কী বলো দেখি। কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এত ক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।'

ব্যোম কহিল, 'শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্য গীত বাদ্য -দ্বারা শুক্রতনয়া দেব-যানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।'

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতরমুখে কহিল, 'গল্পটি বারো হাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড়ো হইবে না, কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়িবে।'

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল, 'কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।'

শুনিয়া সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, 'আমি এই বেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।'

সমীর দুই হাতে তাহার জামা ধরিয়া, টানিয়া বসাইয়া কহিল, 'সংকটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়!'

ব্যোম কহিল, 'জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখদুঃখ বিপদ্‌সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যত দিন ছাত্র-অবস্থায় থাকে তত দিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন জোগাইবার অপূর্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সংগীত বাজাইতে থাকে যে, ধরাতলে সৌন্দর্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ গন্ধ স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহার -পূর্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।'

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'যদি এমন ভাবে দেখ, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না; তাই সে বলিতেছে, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল!' তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইতে পারে না; তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,'সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ, শ্রুতিপথে পরশ না গেল।' আবার এই প্রাণপ্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে; অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মতো সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে; প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয়, যাহাতে আতিথ্যের

ত্রুটি না হইতে পারে, সে জন্য সর্বদাই সে তাহার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালোবাসার পরে তবু এক দিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। বলে, 'প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্বিশেষে ভালোবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব।' কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে, 'বন্ধু, অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মতো ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এত দিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই, কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকার নিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলাম?' এই করুণ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অবসান, সেই মাথুর যাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ— তাহার মতো এমন শোচনীয় বিরহদৃশ্য কোন্ প্রেমকাব্যে বর্ণিত আছে!'

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল, 'তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না, মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি। তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্বপ্রথম প্রেম এবং জীবনের সর্বপ্রথম প্রেম সর্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে, জগতের সর্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদিপ্রেম এই দেহের ভালোবাসা যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনো পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই— সেদিন কোনো কবি উপস্থিত ছিল না, কোনো ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই

—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল যে, এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে, প্রেম-নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম। কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্তমনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্তত কিছু দীর্ঘকাল দেহ-দেবযানীর আশ্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করে। তোমরাও সেই আশীর্বাদ করো।'

সমীর কহিল, 'ভ্রাতঃ ব্যোম, তোমার মুখে তো কখনো শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খৃস্টানের মতো কথা কহিলে। জীবাত্মা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গ লাভ করিয়া সুখদুঃখের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ-সকল মত তো তোমার পূর্বমতের সহিত মিলিতেছে না।'

ব্যোম কহিল, 'এ-সকল কথায় মতের মিল করিবার চেষ্টা করিয়ো না। এ সকল গোড়াকার কথা লইয়া আমি কোনো মতের সহিতই বিবাদ করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসায়ে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্য-প্রচলিত মুদ্রা লইয়া মূলধন সংগ্রহ করে; কথাটা এই দেখিতে হইবে ব্যাবসা চলে কি না। জীব সুখদুঃখ-বিপদসম্পদের মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার জন্য সংসারশিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া জীবনযাত্রা সুচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মুদ্রাটি মেকি নহে। আবার যখন প্রসঙ্গক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে

তখন দেখাইয়া দিব যে, আমি যে ব্যাঙ্ক্‌নোটটি লইয়া জীবনবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিধাতার ব্যাঙ্কে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।'

ক্ষিতি করুণস্বরে কহিল, 'দোহাই ভাই, তোমার মুখে প্রেমের কথাই যথেষ্ট কঠিন বোধ হয়— অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এখান হইতে অবতারণ করিতে হইবে; আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য শুনাইতে পারি।'

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান দিয়া বসিয়া জানলার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল, 'আমি দেখিতেছি এভোল্যুশন থিয়োরি অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ অভ্যাস করিতেছে, সহস্র বৎসর কেন, লক্ষসহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি নিষ্ঠুর প্রেমিক, চঞ্চল অতিথি, তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে।'

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ হইতে না হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল, 'তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায়-গ্রহণ, গুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।'

ব্যোম গম্ভীর ভাবে কহিতে লাগিল, 'ঠিক বটে। ওগুলা তাৎপর্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্তত দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণ পদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা এক বার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভালোবাসিতেও হইবে এবং সে ভালোবাসা কাটিতেও হইবে— সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। নূতন নিয়ম যখন কালক্রমে প্রাচীন প্রথা-রূপে আমাদিগকে এক স্থানে আবদ্ধ করে তখন সমাজবিপ্লব আসিয়া তাহাকে উৎপাটন-পূর্বক আমাদিগকে মুক্তি দান করে। যে পা ফেলি সে পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয়, নতুবা চলা হয় না— অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে বিচ্ছেদবেদনা— ইহা বিধাতার বিধান।'

সমীর কহিল, 'গল্পটার সর্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেহ সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যালাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে, কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না; আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্য বাহির করিয়াছি, যদি ধৈর্য থাকে তো বলি।'

ক্ষিতি কহিল, 'ধৈর্য থাকিবে কি না পূর্বে হইতে বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমি তো আরম্ভ করিয়া দাও, শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।'

সমীর কহিল, 'ভালো করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক কোনো কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে যে সংসারকে ভালোবাসিল না তাহা নহে, কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল 'তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও' সে কহিল, 'ধরা যদি দিই, তোমার আবর্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না ; সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে।' তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, 'তুমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না। সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার কারণ, নির্লিপ্ত ভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভালো করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না। সেই জন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার মন্ত্রণা কাজে প্রয়োগ করিতেন। ব্রাহ্মণকে রাজাসনে বসাইয়া দিলে ব্রাহ্মণও অগাধ জলে পড়িত এবং রাজ্যকেও অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিত।

'তোমরা যে সকল কথা তুলিয়াছিলে সেগুলা বড়ো বেশি সাধারণ কথা। মনে করো যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য এই যে রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য এই যে উপযুক্ত অবসরে স্ত্রীপুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি

প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে— তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা বলা যায় না।'

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল, 'আমার তো মনে হয় সেই-সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সর্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সংকট হইতে সংকটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে— সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন, দুঃখকাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা নাই, কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য বেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তু-তরুলতা-তৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদে কোনো কালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সংকটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছিল, সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না, অত্যাচারপীড়িত রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জা-নিবারণ -নামক অত্যন্ত সাধারণ স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচ-দেবযানী-সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন

এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।'

সমীর হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। এক্ষণে স্বয়ং কবি কী বিচার করেন এক-বার শুনা যাক।'

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম, 'এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না ; তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই— অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি -অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া— কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মতো একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মতো আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মত-বিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া

দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না— যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই।'

অগ্রহায়ণ ১৩০১

স্রোতস্বিনী কোনো এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভালো লাগে না।'

দীপ্তি আরো প্রবলতর ভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীর কখনো পারতপক্ষে মেয়েদের কোনো কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না। তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল, 'কিন্তু অনেক বড়ো বড়ো সমালোচক তাঁহাকে খুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।'

দীপ্তি কহিলেন, 'আগুন যে পোড়ায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য কোনো সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়— ভালো কবিতার ভালোত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।'

আগুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীর তাহা জানিত, এই জন্য সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ব্যোম বেচারার সে-সকল বিষয়ে কোনোরূপ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, এই জন্য সে উচ্চস্বরে আপন স্বগত-উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

সে বলিল, 'মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইয়া চলে, অনেক সময় তাহাকে নাগাল পাওয়া যায় না—'

ক্ষিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, 'ত্রেতাযুগে হনুমানের শতযোজন লাঙ্গুল শ্রীমান হনুমানজিউকে ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়া পৌঁছিত; লাঙ্গুলের ডগাটুকুতে যদি উকুন বসিত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মানুষের মন হনুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, সেই জন্য এক-এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌঁছায় সমালোচকের ঘোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌঁছে না। লেজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং লেজটা পশ্চাতে পড়িয়া

থাকে— এই জন্যই জগতে লেজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।'

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনশ্চ আরম্ভ করিল, 'বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা। কিন্তু কাণ্ডটি এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানটি জানা এবং দর্শনটি বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেক্ষা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; ইহার জন্য কত ইস্কুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে— তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায় যে, তাহার নাগাল পাইবার জন্য সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে, এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদবাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।'

সমীর কহিল, 'মানুষের হাতে সব জিনিসই ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠে। অসভ্যেরা যেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অনুভব করে। অথচ আমাদের এমনি গ্রহ যে, বিশেষ অভ্যাসসাধ্য শিক্ষাসাধ্য সংগীত ব্যতীত আমাদের সুখ নাই। আরো গ্রহ এই যে, ভালো গান করাও যেমন শিক্ষাসাধ্য, ভালো গান হইতে সুখ অনুভব করাও তেমনি শিক্ষা-সাধ্য। তাহার ফল হয় এই যে, এক সময় যাহা সাধারণের ছিল ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে। চীৎকার সকলেই করিতে পারে, এবং চীৎকার করিয়া অসভ্যসাধারণে সকলেই উত্তেজনাসুখ অনুভব করে, কিন্তু গান সকলে করিতে পারে না এবং গানে সকলে সুখও পায় না।

কাজেই সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক, এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।'

ক্ষিতি কহিল, 'মানুষ বেচারাকে এমনি করিয়া গড়া হইয়াছে যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে যায় ততই দুরূহতার মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্য কল তৈরি করে, কিন্তু কল জিনিসটা নিজে এক বিষম দুরূহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ত্ত করা কঠিন কাজ; সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভালো করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো-আনা জীবন দান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-প্রদান চালাইবার জন্য টাকার সৃষ্টি হইল, শেষকালে টাকার সমস্যা এমনি একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে যে মীমাংসা করে কাহার সাধ্য! সমস্ত সহজ করিতে হইবে, এই চেষ্টায় মানুষের জানা-শোনা খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

স্রোতস্বিনী কহিলেন, 'সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন মানুষ খুব স্পষ্টত দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখন অল্প লোক ধনী এবং অনেকে নির্ধন, অল্প লোক গুণী এবং অনেকে নির্‌গুণ। এখন কবিতাও সর্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের। সকলই বুঝিলাম। কিন্তু কথাটা এই যে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা তুলিয়াছি সে কবিতাটা কোনো অংশেই শক্ত নহে; তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের মতো লোকও বুঝিতে না পারে— তাহা নিতান্তই সরল। অতএব তাহা যদি ভালো না লাগে, তবে সে আমাদের বুঝিবার দোষে নহে।'

ক্ষিতি এবং সমীর ইহার পরে আর কোনো কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু ব্যোম অম্লান মুখে বলিতে লাগিল, 'যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোনো কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন ; কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোনোপ্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনোরূপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না। প্রাঞ্জলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহার কোনো মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে-সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে হয়, প্রাঞ্জলতা তাহাদের নিকট বড়োই দুর্বোধ। কৃষ্ণনগরের কারিগরের রচিত ভিস্তি তাহার সমস্ত রঙচঙ মশক এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ; কিন্তু গ্রীক প্রস্তরমূর্তিতে রঙচঙ রকম-সকম নাই— তাহা প্রাঞ্জল এবং সর্বপ্রকার-প্রয়াস-বিহীন। কিন্তু তাই বলিয়া সহজ নহে। সে কোনোপ্রকার তুচ্ছ বাহ্য কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।'

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, 'তোমার গ্রীক প্রস্তরমূর্তির কথা ছাড়িয়া দাও। ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে। ভালো জিনিসের দোষ এই যে, তাহাকে সর্বদাই পৃথিবীর চোখের সামনে থাকিতে হয়, সকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পর্দা নাই, আব্রু নাই ; তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না, কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধিগৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সূর্যের যেমন মাঝে মাঝে মেঘগ্রস্ত

থাকা উচিত, নতুবা মেঘমুক্ত সূর্যের গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড়ো বড়ো খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে সেইরূপ অবহেলার আড়াল পড়া উচিত— মাঝে মাঝে গ্রীক মূর্তির নিন্দা করা ফেশান হওয়া ভালো, মাঝে মাঝে সর্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড়ো কবি। নতুবা আর সহ্য হয় না। যাহা হউক, ওটা একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে, আচারের বর্বরতাকে, সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়— অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়— সে কথাটাও মনে রাখা কর্তব্য।'

আমি কহিলাম, 'কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার। অধিক অলংকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাংলা ভাষায় কি খবরের কাগজে কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়— সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া, এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালোবাসে— বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এখনো আমাদের মধ্যে একটা আদিম বর্বরতা আছে ; সত্য প্রাঞ্জল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহার মর্যাদা নষ্ট হয়।'

সমীর কহিল, 'সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোনোপ্রকার গায়ে-পড়া আতিশয্য দ্বারা আপন অস্তিত্ব উৎকট ভাবে প্রচার করে না ; বিনয় এবং সংযমের দ্বারা তাহারা আপন মর্যাদা

রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময় সাধারণ লোকের নিকট সংযত সুসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয্যের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয়, কিন্তু সেটা ভদ্রতার দুর্ভাগ্য নহে—সে সাধারণের ভাগ্যদোষ। সাহিত্যে সংযম এবং আচারব্যবহারে সংযম উন্নতির লক্ষণ, আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্বরতা।'

আমি কহিলাম, 'এক-আধটা ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে তেমনি ভদ্র সাহিত্যেও ম্যানার আছে, কিন্তু ম্যানারিজ ম্ নাই। ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোনো অপূর্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে। কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে, পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।'

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, 'উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এই জন্য কঠিন যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয়, কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।'

দীপ্তি কহিল, 'নমস্কার করি! আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনো উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্বরতা প্রকাশ করিব না।'

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, 'তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভালো লাগে না।'

চৈত্র ১৩০১

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুর-রস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপসা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারি দিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসংগত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কী একটা রহস্য-প্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল, এই উৎকট নীল-হরিৎ-পশমরাশি-পরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্য-রসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। সে চৌকিটা আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল, 'দূর হইতে এক জন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোনো একটা কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চকমকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন, উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। আর মানিকের টুকরা আপনা-আপনি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোনো একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।'

সমীর নিঃশেষিত পাত্রে দ্বিতীয় বার চা ঢালিয়া কহিল, 'কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোনো সুখের কারণ ঘটে, এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় আছে।'

ক্ষিতি কহিল, 'রক্ষা করো ভাই। না ভাবিয়া আশ্চর্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট আছে; আগে সেইগুলো শেষ করো, তার পরে ভাবিতে শুরু করিয়ো। এক জন পাগল তাহার উঠানকে ধূলিশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত ঝাঁটা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল, এই ধূলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিব্য একটি পরিষ্কার উঠান পাইবে। বলা বাহুল্য, বিস্তর অধ্যবসায়েও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ভ্রাতঃ সমীর, তুমি যদি আশ্চর্যের উপরি-স্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে আরম্ভ কর, তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, কিন্তু সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।'

সমীর হাসিয়া কহিল, 'ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমারই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও সৃষ্টির একটা মহাশ্চর্য ব্যাপার মনে হইতে পারিত, কিন্তু আরও ঢের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত তোমার সেই উঠান-মার্জন-কারী আদর্শটির সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিতে না।'

ক্ষিতি কহিল, 'মাপ করো ভাই, তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সেই জন্যই আমার মনে এতটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাটা এই যে, কৌতুকে আমরা হাসি কেন। ভারী আশ্চর্য! কিন্তু তাহার পরের প্রশ্ন এই যে, যে কারণেই হউক হাসি কেন। একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মনুষ্যের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসংগত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অবমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন, দুঃখের চিহ্ন, প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন— আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভ্যসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—'

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, 'তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এই জন্য কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোক-মাত্রেই ছ্যাব্‌লামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটিরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন। শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হুঁকা হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে, কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে— তবুও যে আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে তো কী? এই জন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞসমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন-কি স্বার্থবোধেরও যোগ

নাই। অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য পরাভব, স্থৈর্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মনস্বী জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।'

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল, 'সে কথা সত্য। কোনো অখ্যাতনামা কবি -বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

'তৃষার্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনা-মতে তাহাকে এক ঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনাবৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই; কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কী বৃত্তি -প্রভাবে, আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইরূপ— কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি। এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।'

ব্যোম কহিল, 'প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। ভৌতিক জগতে আলোক এবং বজ্র ইহার তুলনা। একটা আন্দোলন-জনিত, স্থায়ী; অপরটি সংঘর্ষজনিত, আকস্মিক। আমি বোধ করি, যে কারণভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য এবং কৌতুকহাস্যের কারণ

বাহির হইয়া পড়িবে।'

সমীর ব্যোমের আজগবি কল্পনায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, 'আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে, বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্পপরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না; কিন্তু যেদিন চড়িভাতি করা যায় সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া, অসময়ে সম্ভবত অখাদ্য আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনাশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেইজাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে, তাঁহাকে হুঁকা হস্তে রাধিকার কুটিরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূমপিপাসুতার গান গাহিত, তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি-আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাত-স্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক— চেতনাকে পীড়ন, আমোদও তাই। এই জন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের

প্রকাশ উচ্চহাস্য ; সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়ন-বেগে সশব্দে ঊর্ধ্বে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।'

ক্ষিতি কহিল, 'তোমরা যখন একটা মনের মতো থিয়োরির সঙ্গে একটা মনের মতো উপমা জুড়িয়া দিতে পার তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে, কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে, মৃদুহাস্যও হাসি, এমন-কি মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরের বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য, সমস্তই চিরাভ্যস্ত চিরপ্রত্যাশিত ; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি-মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষ-রূপে অনুভব করিতে পারি না— ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারি দিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অতিদুঃখেরও নহে— সেই জন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।'

আমি কহিলাম, 'অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন-কি ভয় পাইতেও সুখ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতা-বিয়োগে রামের দুঃখে

আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশর-বিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি— কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে-সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি। কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন, অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন, হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ, এবং কর্ণবধিরকর খোল-করতালের শব্দ -দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মতো একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।'

ক্ষিতি কহিল, 'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—'

ব্যোম কহিল, 'যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে, এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—'

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন, 'তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ?'

ক্ষিতি কহিল, 'আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে তোমরা এত ক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।'

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, 'আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।'

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য-উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জন-পূর্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জ ভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাস-দৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল, 'ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ-বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা দেখি না।'

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেক ক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 'ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয় না ট্র্যাজেডির উপকরণ?'

পৌষ ১৩০১

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

'এক দিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য। জগৎসৃষ্টি-অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে, এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালোমন্দ নানা আকারে স্থায়ী হইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন-কি শার্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী, চতুর্দশপদীর আদি-কারণ হইয়াছে এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরলস্বভাববশত অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এই বার দেখিলাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা পূর্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।'

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে যে যুক্তির প্রাবল্য ছিল না, সেজন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্য হইতে আমরা তত্ত্ব বাহির করিব এ কথা তাঁহারা যেমন কল্পনা করেন নাই, আমাদের তত্ত্ব হইতে তাঁহারা যে যুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছেন, 'আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি।' আমরা চার বুদ্ধিমানে ক্ষণকালের কথোপকথনে নুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না, আমরা বালির ঘর বাঁধি মাত্র। ঐ খেলাটার উপলক্ষ করিয়া জ্ঞানসমুদ্র হইতে খানিকটা সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আসি না, খানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি; তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

রত্ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য যে কম বহুমূল্য, আমি তাহা মনে করি না। রত্ন অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু বলিবার জো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া এ পর্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, কিন্তু তবু যত বার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্তসঞ্চালন হইয়াছে এবং সেজন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচ জনের গড়ের মাঠ; এখানে সত্যের শস্য-লাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দ-লাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোনো কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি

নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন-কি সত্যক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘুপদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আর এক দিক হইতে আর এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ উপকারী, কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড়ো আরামের। জর্মান পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে-সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পারো, কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যে ভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক, তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে-সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনোটাই শেষ কথা নহে। যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা। আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মতো হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীর ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা হইত, কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপকথন-সমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার অংশকে শেষ পর্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায়ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত যে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক-এক বার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি ; সেখানে যেখানেই পা ফেলি হাঁটু পর্যন্ত বসিয়া যায়, চলা দায় হইয়া উঠে। এমন-সকল বিষয়

আছে যাহাতে প্রতি পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই-সকল অনিশ্চিত সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো। সে-সব জমি বায়ুসেবী পর্যটনকারীদের উপযোগী নহে, কৃষি যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভালো।

যাহা হউক, সেদিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম যে, যেমন দুঃখের কান্না তেমনি সুখের হাসি আছে, কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল। কৌতুক জিনিসটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখদুঃখ অনুভব করে, কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলংকারশাস্ত্রে যে ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে, কেবল হাস্যরসটা নাই। হয়তো বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরো অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসংগত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাইবার কোনো অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দেশ করিয়া-ছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়— উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, হয়তো আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্য-ভেদ হইতে পারে।

সাধারণ ভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়ম -সংগত নহে ; তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিনের, তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে ; সেই পীড়াটা অতি অধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসংগত তাহা চিরদিনের নিয়ম-সম্মত, যাহা অসংগত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই। হঠাৎ না হইলে কিম্বা আর এক-রূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্যন্ত গিয়াছিলাম, আর বেশি দূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট খাইলে কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্প মাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে, পীড়নমাত্রেই

কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না। অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক কৌতুকপীড়নের বিশেষ উপকরণটা কী।

জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড়ো পাথর ছোটো পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী-নির্ঝর পর্বত-সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়— তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোনো স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থ-সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃতসাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহলবৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা, কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসংগতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসংগতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড়পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথাও এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনোরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই,

ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি এক জন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসংগত ঠেকে ; কারণ, তাহা অনিবার্য নিয়ম -সংগত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না ; কারণ সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক, সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না, এই জন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসংগত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এই জন্য অনপেক্ষিত হুঁচট বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালীর মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে— ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার জো নাই। কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন, তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। নীতি যেমন জড়ে নাই, অসংগতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সংগত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিসটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর ; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজউদ্দৌলা দুই জনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পূরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়— উভয়ে যখন হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসংগতি কোন্‌খানে। নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসংগতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ,

হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি —এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্যই পাঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রা-ভেদ মাত্র। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দভের নিকট অনেক টাইটিনিয়া অপূর্ব মোহ -বশত যে আত্মবিসর্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফল্‌স্টাফ উইণ্ড্‌সর-বাসিনী রঙ্গিনীর প্রেম -লালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ; রামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া, বনবাসপ্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যসুখের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল— গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে— একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ, অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারি যখন অনেক ক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়। কিন্তু কোনো লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্ম-কাল অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় না। কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, একটা রসিক শয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য। সে তখন এই সকল অমর-আত্মা-ধারী জীর্ণকলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে পারে, 'ঐ তো তোমাদের ষড়্‌দর্শন, তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে, নাই শুধু দুই-মুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুলকণা, অম্‌নি তোমাদের অমর আত্মা, তোমাদের জগদ্‌বিজয়ী মনুষ্যত্ব একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে!'

স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

ফাল্গুন ১৩০১

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত ছিলেন না, কেবল আমরা চারি জন ছিলাম।

সমীর বলিল, 'দেখো, সেদিনকার সেই কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা কিছু অদ্ভুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বুদ্ধি অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কৌতুক তাহাদিগকে সহসা বিচলিত করিতে পারে না।'

ক্ষিতি কহিল, 'প্রথমত তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়ত অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ শব্দটা ইংরাজি।'

সমীর কহিল, 'প্রথম অপরাধটা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না, অতএব সুধীগণকে ওটা নিজগুণে মার্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম— যাহারা দ্রব্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার গুণটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্যরসরসিক হয় না।'

ক্ষিতি মাথা নাড়িয়া কহিল, 'উঁহুঁ, এখনো পরিষ্কার হইল না।'

সমীর কহিল, 'একটা উদাহরণ দিই। প্রথমত দেখো, আমাদের সাহিত্যে কোনো সুন্দরীর বর্ণনা-কালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিবার দিকে লক্ষ নাই; সুমেরু দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওয়া হয় এবং সুন্দরীমাত্রেরই প্রতি তাহার আরোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মতো স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না, সেইজন্য কৌতুকের একটি প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে। এ

তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভূত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল কেন ? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্রগমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না। যখন একটা সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তখন সুন্দর উপমা নির্বাচন করা আবশ্যক ; কারণ, উপমার কেবল সাদৃশ্য-অংশ নহে, অন্যান্য অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্য হাতির শুঁড়ের সহিত স্ত্রীলোকের হাত-পায়ের বর্ণনা করা সামান্য দুঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাসিল না, বিরক্ত হইল না ; তাহার কারণ, হাতির শুঁড় হইতে কেবল তাহার গোলত্বটুকু লইয়া আর সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য ক্ষমতাটি আছে। গৃধিনীর সহিত কানের কী সাদৃশ্য আছে বলিতে পারি না, আমার তদুপযুক্ত কল্পনাশক্তি নাই ; কিন্তু সুন্দর মুখের দুই পাশে দুই গৃধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাড়তাও আমার নাই। বোধ করি ইংরাজি পড়িয়া আমাদের না-হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকৃত হইয়া যাওয়াতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেখানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে সেখানে কবিরা অনায়াসে গম্ভীরমুখে সুমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন ; তাহার কারণ,অ্যাবৃস্ট্র্যাক্টের দেশে পরিমাণবিচারের আবশ্যকতা নাই।

গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরও উচ্চ ; অতএব অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌ উচ্চতাটুকু মাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের সহিত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে হতভাগ্য কাঞ্চন-জঙ্ঘার উপমা শুনিবামাত্র কল্পনাপটে হিমালয়ের শিখর চিত্রিত দেখিতে পায়, যে বেচারা গিরিচূড়া হইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বড়োই মুশ্‌কিল। ভাই সমীর, তোমার আজিকার এই কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে— প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি।'

ব্যোম কহিল, 'কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে বলা আবশ্যক। আসল কথাটা এই, আমরা অন্তর্জগৎ-বিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে, সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করি না। যেমন ধূমকেতুর লঘু পুচ্ছটা কোনো গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুচ্ছেরই ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহতভাবে অনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের রীতিমত সংঘাত কোনো কালে হয় না— হইলে বহির্জগৎটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রবল সত্য, তাহারা গজেন্দ্র-গমনের উপমায় গজেন্দ্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না— গজেন্দ্র বিপুল দেহ বিস্তার -পূর্বক অটল ভাবে কাব্যের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে, গজ বলো, গজেন্দ্র বলো, কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজ্বল্যমান নহে যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে

সুদ্ধ পুষিতে হইবে।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমরা অন্তরে বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের মতো বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত 'গোলা খা ডালা'— সেই জন্য গজেন্দ্র বলো, সুমেরু বলো, মেদিনী বলো, কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জগৎকে খাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সংগীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। এ পর্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি, এরূপ পরমাশ্চর্য কল্পনা কেমন করিয়া যে কোনো সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে স্থির করা দুরূহ।'

ব্যোম কহিল, 'গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল; এইজন্য অত্যন্ত যত্ন-সহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোনো বিষয়ে পরিমাণলঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেবদেবীর মূর্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন; নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্তিই দিই না কেন, আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোনো বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্তি

আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে; কারণ আমরা সেই মূর্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি— বাহিরের জগতের সহিত, চারি দিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে; আমরা যে-কোনো একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।'

সমীর কহিল, 'যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষ্যটাকে সম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের ইচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্যভাবকে মূর্তি দিতে গেলে কখনোই কোনো অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পীড়া উৎপাদন করিত।'

ব্যোম কহিল, 'আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চ অঙ্গের কলাবিদ্যার ব্যাঘাত করিতে পারে, কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন-কি, সৌন্দর্যভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা-সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোনো আবশ্যক করে না; এমন-কি, ঘোরতর পশুত্ব

থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা এক দিকে স্বামীকে মানুষ-ভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে, আবার অন্য দিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া থাকে। একটাতে অন্যটা অভিভূত হয় না। কারণ, আমাদের মনোজগতের সহিত বাহ্যজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।'

সমীর কহিল, 'কেবল স্বামীদেবতা কেন, পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ দুই বিরোধী ভাব আছে— তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূরীভূত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে-সকল শাস্ত্রকাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্মবুদ্ধির উচ্চ আদর্শ-সংগত নহে; এমন-কি, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সংগীতে সেই-সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে— কিন্তু ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, খেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠি হাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে একহাঁটু গোময়-পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি; কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে-সব কথা মনেও উদয় হয় না।'

ক্ষিতি কহিল, 'আবার দেখো, আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি, অথচ বলিতেছি গাধাই আমা-দিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে। যখন এটা বলি তখন ওটা মনে আনি না, যখন ওটা বলি তখন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতা -বশত ব্যোম যে সুবিধার উল্লেখ করিতেছেন আমি তাহাকে সুবিধা মনে করি না। কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ জ্ঞানলাভ এবং

সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব
আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের
বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্র বার করিয়া পরীক্ষা
করিয়া দেখেন, তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না ; আমরা মনের
মধ্যে যদি বেশ একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি
তবে তাহার সুসংগতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ
বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ
করি। জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন হৃদয়বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা
সৌন্দর্যরসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্ন-সহকারে মনের
আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—
যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি। এমন-কি, আলংকারিক
অত্যুক্তি অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই
অসংগত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে
পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই ; আপন দেবতাকে, আপন
সৌন্দর্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না।
ভক্তিরসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার
কোনো আবশ্যকতা বোধ করি না— অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা
সন্তোষে থাকি। সেই জন্য আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয় ; এ
কথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনি আমাদের গুরু। হয়তো গুরু
আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না,
হয়তো গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মোকদ্দমায় প্রধান মিথ্যাসাক্ষী, তথাপি
তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য— এরূপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্য
ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না ; দিব্য আরামে ভক্তি করা যায়।'
সমীর কহিল, 'ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার

ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্বে কৃষ্ণকে নির্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা-কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কথা বলেন নাই যে, দেবতার কোনো কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন; তিনি পূজাবিতরণের পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।'

ক্ষিতি কহিল, 'এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার, প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, সেই জন্য বিনা চেষ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তি-বৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতা-লাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী -অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না। সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই —এরূপ পরম-সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারঘাত করা হয়।'

মাঘ ১৩০১

স্রোতস্বিনী কহিল, 'দেখো, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম আছে, তোমরা ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ পরিয়া আসিতে বলিয়ো।'

শুনিয়া আমরা সকলে হাসিতে লাগিলাম। দীপ্তি একটু রাগ করিয়া বলিল, 'না, হাসিবার কথা নয়। তোমরা ব্যোমকে সাবধান করিয়া দাও না বলিয়া সে ভদ্রসমাজে এমন উন্মাদের মতো সাজ করিয়া আসে। এ-সকল বিষয়ে একটু সামাজিক শাসন থাকা দরকার।'

সমীর কথাটাকে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দরকার?'

দীপ্তি কহিল, 'কাব্যরাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন— কবি যেমন ছন্দের কোনো শৈথিল্য, মিলের কোনো ত্রুটি, শব্দের কোনো রূঢ়তা মার্জনা করিতে চাহে না— আমাদের আচারব্যবহার বসনভূষণ সম্বন্ধে সমাজপুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ এবং সৌন্দর্য কখনোই রক্ষা হইতে পারে না।'

ক্ষিতি কহিল, 'ব্যোম বেচারা যদি মানুষ না হইয়া শব্দ হইত তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি, ভট্টিকাব্যেও তাহার স্থান হইত না— নিঃসন্দেহ তাহাকে মুগ্ধবোধের সূত্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইত।'

আমি কহিলাম, 'সমাজকে সুন্দর সুশিষ্ট সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য সে কথা মানি, কিন্তু অন্যমনস্ক ব্যোম বেচারা যখন সে কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে চলিয়া যায় তখন তাহাকে মন্দ লাগে না।'

দীপ্তি কহিল, 'ভালো কাপড় পরিলে তাহাকে আরও ভালো লাগিত।'

ক্ষিতি কহিল, 'সত্য বলো দেখি, ভালো কাপড় পরিলে ব্যোমকে

কি ভালো দেখাইত। হাতির যদি ঠিক ময়ূরের মতো পেখম হয় তাহা হইলে কি তাহার সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়? আবার ময়ূরের পক্ষেও হাতির লেজ শোভা পায় না। তেমনি আমাদের ব্যোমকে সমীরের পোশাকে মানায় না, আবার সমীর যদি ব্যোমের পোশাক পরিয়া আসে উহাকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া যায় না।'

সমীর কহিল, 'আসল কথা, বেশভূষা আচারব্যবহারের স্খলন যেখানে শৈথিল্য অজ্ঞতা ও জড়ত্ব সূচনা করে সেইখানেই তাহা কদর্য দেখিতে হয়। সেই জন্য আমাদের বাঙালিসমাজ এমন শ্রীবিহীন। লক্ষ্মীছাড়া যেমন সমাজছাড়া, তেমনি বাঙালিসমাজ যেন পৃথ্বীসমাজের বাহিরে। হিন্দুস্থানির সেলামের মতো বাঙালির কোনো সাধারণ অভিবাদন নাই। তাহার কারণ, বাঙালি কেবল ঘরের ছেলে, কেবল গ্রামের লোক। সে কেবল আপনার গৃহসম্পর্ক এবং গ্রামসম্পর্ক জানে, সাধারণ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই— এ জন্য অপরিচিত সমাজে সে কোনো শিষ্টাচারের নিয়ম খুঁজিয়া পায় না। এক জন হিন্দুস্থানি, ইংরাজকেই হউক আর চীনেম্যানকেই হউক, ভদ্রতাস্থলে সকলকেই সেলাম করিতে পারে; আমরা সে স্থলে নমস্কার করিতেও পারি না, সেলাম করিতেও পারি না, আমরা সেখানে বর্বর। বাঙালি স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্বদাই অসম্বৃত— তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে; এই জন্য ভাশুর-শ্বশুর-সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে-সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজসংগত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়। গায়ে কাপড় রাখা বা না রাখার বিষয়ে বাঙালি পুরুষদেরও অপর্যাপ্ত ঔদাসীন্য; চিরকাল অধিকাংশ সময় আত্মীয়সমাজে বিচরণ করিয়া এ সম্বন্ধে একটা অবহেলা তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব

বাঙালির বেশভূষা চালচলনের অভাবে একটা অপরিমিত আলস্য শৈথিল্য স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায়, সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ বর্বরতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'

আমি কহিলাম, 'কিন্তু সে জন্য আমরা লজ্জিত নহি। যেমন রোগ-বিশেষে মানুষ যাহা খায় তাহাই শরীরের মধ্যে শর্করা হইয়া উঠে, তেমনি আমাদের দেশের ভালোমন্দ সমস্তই আশ্চর্য মানসিক বিকার-বশত কেবল অতিমিষ্ট অহংকারের বিষয়েই পরিণত হইতেছে। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অশনবসনগত সভ্যতা নহে, সেই জন্যই এই-সকল জড় বিষয়ে আমাদের এত অনাসক্তি।'

সমীর কহিল, 'উচ্চতম বিষয়ে সর্বদা লক্ষ স্থির রাখাতে নিম্নতন বিষয়ে যাঁহাদের বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্য জন্মে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা কাহারও মনেও আসে না। সকল সভ্যসমাজেই এরূপ এক সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বিরল উচ্চশিখরে বাস করিয়া থাকেন। অতীত ভারতবর্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপন-শীল ব্রাহ্মণ এই-শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন; তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সাজসজ্জা ও কাজকর্মে নিরত থাকিবেন এমন কেহ আশা করিত না। য়ুরোপেও সে সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এখনো আছে। মধ্যযুগের আচার্যদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, আধুনিক য়ুরোপেও নিউটনের মতো লোক যদি নিতান্ত হাল ফ্যাশানের সান্ধ্যবেশ না পরিয়াও নিমন্ত্রণে যান এবং লৌকিকতার সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন, তথাপি সমাজ তাঁহাকে শাসন করে না, উপহাস করিতেও সাহস করে না। সর্বদেশে সর্বকালেই স্বল্পসংখ্যক মহাত্মা লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না, এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে, কেবল কতকগুলি লোক নহে, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই সকল প্রকার স্বভাববৈচিত্র্য ভুলিয়া সেই সমাজাতীত আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি। আমরা ঢিলা কাপড় এবং অত্যন্ত ঢিলা আদবকায়দা লইয়া দিব্য আরামে ছুটি ভোগ করিতেছি। আমরা যেমন করিয়াই থাকি আর যেমন করিয়াই চলি তাহাতে কাহারও সমালোচনা করিবার কোনো অধিকার নাই, কারণ আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই খাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্‌গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।'

হেনকালে ব্যোম তাহার বৃহৎ লগুড়খানি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ অন্য দিনের অপেক্ষাও অদ্ভুত। তাহার কারণ, আজ ক্রিয়াকর্মের বাড়ি বলিয়াই তাহার প্রাত্যহিক বেশের উপরে বিশেষ করিয়া একখানা অনির্দিষ্ট-আকৃতি চাপকান-গোছের পদার্থ চাপাইয়া আসিয়াছে, তাহার আশপাশ হইতে ভিতরকার অসংগত কাপড়গুলার প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে— দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, এবং দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার উদয় হইল।

ব্যোম জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের কী বিষয়ে আলাপ হইতেছে?'

সমীর আমাদের আলোচনার কিয়দংশ সংক্ষেপে বলিয়া কহিল, 'আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যের 'ভেক' ধারণ করিয়াছি।'

ব্যোম কহিল, 'বৈরাগ্য ব্যতীত কোনো বৃহৎ কর্ম হইতেই পারে না। আলোকের সহিত যেমন ছায়া, কর্মের সহিত তেমনি বৈরাগ্য নিয়ত সংযুক্ত হইয়া আছে। যাহার যে পরিমাণে বৈরাগ্যে অধিকার, পৃথিবীতে সে সেই পরিমাণে কাজ করিতে পারে।'

ক্ষিতি কহিল, 'সেই জন্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক যখন সুখের প্রত্যাশায় সহস্র চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তখন বৈরাগী ডারুয়িন সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারটি আহরণ করিতে ডারুয়িনকে অনেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইয়াছিল।'

ব্যোম কহিল, 'বহুতর আসক্তি হইতে গারিবাল্‌ডি যদি আপনাকে স্বাধীন করিতে না পারিতেন তবে ইটালিকেও তিনি স্বাধীন করিতে পারিতেন না। যে-সকল জাতি কর্মিষ্ঠ জাতি তাহারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে। যাহারা জ্ঞানলাভের জন্য জীবন ও জীবনের সমস্ত আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ধাবিত হইতেছে, যাহারা ধর্মবিতরণের জন্য নরমাংসভুক্‌ রাক্ষসের দেশে চিরনির্বাসন বহন করিতেছে, যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুঃসহ ক্লেশ এবং অতিনিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তাহারাই জানে যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে। আর আমাদের এই কর্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপতিত জাতির মূর্ছাবস্থামাত্র— উহা জড়ত্ব, উহা অহংকারের বিষয় নহে।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমাদের এই মূর্ছাবস্থাকে আমরা আধ্যাত্মিক 'দশা' পাওয়ার অবস্থা মনে করিয়া নিজের প্রতি নিজে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি।'

ব্যোম কহিল, 'কর্মীকে কর্মের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই সে আপন কর্মের নিয়মপালন উপলক্ষে সমাজের অনেক ছোটো কর্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে— কিন্তু অকর্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না। যে লোক তাড়াতাড়ি আপিসে বাহির হইতেছে তাহার

নিকটে সমাজ সুদীর্ঘ সুসম্পূর্ণ শিষ্টালাপ প্রত্যাশা করে না। ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া বাগানের কাজ করে তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোনো কাজ নাই, কর্ম নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্শ্বে নিজের গৃহদ্বারপ্রান্তে স্থূল বর্তুল উদর উদ্‌ঘাটিত করিয়া, হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্বোধের মতো তামাক টানি, তখন বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের, কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি! যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোনো মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।'

ব্যোমের মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া স্রোতস্বিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমরা সকল ভদ্রলোকেই যত দিন না আপন ভদ্রতা-রক্ষার কর্তব্য সর্বদা মনে রাখিয়া আপনাদিগকে বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে সর্বতোভাবে ভদ্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব, তত দিন আমরা আত্মসম্মান লাভ করিব না এবং পরের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইব না। আমরা নিজের মূল্য নিজে অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছি।'

ক্ষিতি কহিল, 'সে মূল্য বাড়াইতে হইলে এ দিকে বেতনবৃদ্ধি করিতে হয়, সেটা প্রভুদের হাতে।'

দীপ্তি কহিল, 'বেতনবৃদ্ধি নহে, চেতনবৃদ্ধির আবশ্যক। আমাদের দেশের ধনীরাও যে অশোভন ভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা এবং মূঢ়তা -বশত, অর্থের অভাবে নহে। যাহার টাকা আছে সে মনে করে জুড়িগাড়ি না হইলে তাহার ঐশ্বর্য প্রমাণ হয় না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভদ্রলোকের গোশালারও

অযোগ্য। অহংকারের পক্ষে যে আয়োজন আবশ্যক তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে; কিন্তু আত্মসম্মানের জন্য, স্বাস্থ্যশোভার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার বেলায় আমাদের টাকা কুলায় না। আমাদের মেয়েরা এ কথা মনেও করে না যে, সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য যতটুকু অলংকার আবশ্যক তাহার অধিক পরিয়া ধনগর্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত অভদ্রতা— এবং সেই অহংকারতৃপ্তির জন্য টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাঙ্গণপূর্ণ আবর্জনা এবং শয়নগৃহভিত্তির তৈলকজ্জলময় মলিনতা -মোচনের জন্য তাহাদের কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ ভদ্রতার আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'তাহার প্রধান কারণ, আমরা অলস। টাকা থাকিলেই বড়োমানুষি করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবি করা চলে। কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য-অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়—সর্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে হয়।'

ক্ষিতি কহিল, 'কিন্তু আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু, অতএব অত্যন্ত সরল। ধুলায় কাদায় নগ্নতায়, সর্বপ্রকার নিয়মহীনতায়, আমাদের কোনো লজ্জা নাই—আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক।'

শ্রাবণ ১৩০২

বাড়িতে একটা শুভকার্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবত বাজিতেছিল। ব্যোম অনেক ক্ষণ মুদ্রিতচক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমাদের এই-সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যু-শোকের ভাব আছে; স্বরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলই অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতন নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য। কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভালো লাগিতেছে কেন? কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে। মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মতো সকরুণ বটে, কিন্তু এই রাগিণীর মতোই সুন্দর। জগৎসংসারের বক্ষের উপরে গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে, এই গানের সুরে সেইটাকে কী এক মন্ত্র-বলে লঘু করিয়া দিতেছে। এক জনের হৃদয়-কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চীৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধকরুণাপূর্ণ অথচ অনন্তসান্ত্বনা-ময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে।'

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী আতিথ্যের কাজ সারিয়া সবেমাত্র আসিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় আজিকার এই মঙ্গলকার্যের দিনে ব্যোমের মুখে মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ব্যোম তাহাদের বিরক্তি না বুঝিতে পারিয়া অবিচলিত অম্লানমুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। নহবতটা বেশ লাগিতেছিল, আমরা আর সেদিন বড়ো তর্ক করিলাম না।

ব্যোম কহিল, 'আজিকার এই বাঁশি শুনিতে শুনিতে একটা কথা

বিশেষ করিয়া আমার মনে উদয় হইতেছে। প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ রস থাকে— অলংকারশাস্ত্রে যাহাকে আদি করুণ শান্তি -নামক ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ করিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, জগৎ-রচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড়ো দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যে দিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তি-হীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড়-অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে। একে যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল, আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না— তবে তাহার উপরে আর আপিল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?'

সমীর কহিল, 'মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো মর্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমি সে জন্য বেশি চিন্তিত নহি ; আমার মতে মৃত্যুর অভাবে কোনো বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না, সেইটাই সব চেয়ে চিন্তার কারণ। সে অবস্থায় ব্যোম যদি অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিত কেহ জোড়হাত করিয়া এ কথা বলিতে পারিত না যে, 'ভাই, এখন আর সময় নাই, অতএব ক্ষান্ত হও।' মৃত্যু না থাকিলে অবসরের অন্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত-আট বৎসর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্য ফেল করিয়া নিশ্চিন্ত হয় ; তখন কোনো বিশেষ বয়সে আরম্ভ করারও কারণ থাকিত না, কোনো বিশেষ বয়সে শেষ করিবারও তাড়া থাকিত না। সকল প্রকার কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার কমা সেমিকোলন দাঁড়ি একেবারেই উঠিয়া যাইত।'

ব্যোম এ-সকল কথায় যথেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া গেল, 'জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী, সেই জন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে কখনো তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, সুবিচার মৃত্যুর পরে ; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে— জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার,

আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী— আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতনে।'

মূলতান বারোয়াঁ শেষ করিয়া সূর্যাস্তকালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে নহবতে পূরবী বাজিতে লাগিল। সমীর বলিল, 'মানুষ মৃত্যুর পারে যে-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির সুরে সেই-সকল চিরাশ্রুসজল হৃদয়ের ধনগুলিকে পুনর্বার মনুষ্যলোকে ফিরাইয়া আনিতেছে। সাহিত্য এবং সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে। মৃত্যু যেমন জগতের অসীম রূপ ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে এক অনন্ত বাসরশয্যায় এক পরমরহস্যের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই রুদ্ধদ্বার বাসরগৃহের গোপন বাতায়নপথ হইতে অনন্ত সৌন্দর্যের সৌগন্ধ্য এবং সংগীত আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তেমনি সাহিত্যরস এবং কলারস আমাদের জড়ভারগ্রস্ত বিক্ষিপ্ত প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষের, অনিত্যের সহিত নিত্যের, তুচ্ছের সহিত সুন্দরের, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সহিত বিশ্বব্যাপী বৃহৎ রাগিণীর যোগসাধন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের সমস্ত প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব না এই পৃথিবীতেই রাখিব, ইহা লইয়াই তর্ক। আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম বলিতেছে, পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান; নবীন সাহিত্য এবং ললিতকলা বলিতেছে, 'ইহলোকেই আমরা তাহার স্থান দেখাইয়া দিতেছি।' '

ক্ষিতি কহিল, 'এই প্রসঙ্গে আমি এক অপূর্ব রামায়ণ-কথা বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি।—

'রাজা রামচন্দ্র— অর্থাৎ মানুষ— প্রেম-নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন, উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশ-জাতা রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে? এক, অগ্নিপরীক্ষা আছে, সে তো দেখা হইয়াছে— অগ্নিতে ইঁহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে এক দিন মৃত্যু-তমসার তীরে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা -নামক যুগলসন্তান প্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ তাহাদের পরি-ত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনো উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। এখনো দেখিবার আছে— জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্যধর্মের, না প্রেমমঙ্গলগায়ক দুটি অমর শিশুর।'

আষাঢ় ১৩০২

বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরম লক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। তদুপলক্ষে ব্যোম কহিল, 'যদিও আমাদের কৌতূহলবৃত্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি তথাপি আমার বিশ্বাস, আমাদের কৌতূহলটা ঠিক বিজ্ঞানের তল্লাশ করিতে বাহির হয় নাই; বরঞ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সে খুঁজিতে যায় পরশ-পাথর, বাহির হইয়া পড়ে একটা প্রাচীন জীবের জীর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; সে চায় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, পায় দেশালাইয়ের বাক্স। আল্‌কিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিস্ট্রি তাহার অপ্রার্থিত সিদ্ধি; অ্যাস্ট্রলজির জন্য সে আকাশ ঘিরিয়া জাল ফেলে, কিন্তু হাতে উঠিয়া আসে অ্যাস্ট্রনমি। সে নিয়ম খোঁজে না, সে কার্যকারণ-শৃঙ্খলের নব নব অঙ্গুরি গণনা করিতে চায় না; সে খোঁজে নিয়মের বিচ্ছেদ; সে মনে করে কোন্ সময়ে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইবে সেখানে কার্যকারণের অনন্ত পুনরুক্তি নাই। সে চায় অভূতপূর্ব নূতনত্ব— কিন্তু বৃদ্ধ বিজ্ঞান নিঃশব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার সমস্ত নূতনকে পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার ইন্দ্রধনুকে পরকলা-বিচ্ছুরিত বর্ণমালার পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং পৃথিবীর গতিকে পক্কতালফলপতনের সমশ্রেণীয় বলিয়া প্রমাণ করে।

'যে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের সর্বত্রই সেই এক নিয়ম প্রসারিত, এই আবিষ্কারটি লইয়া আমরা আজকাল আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই আনন্দ, এই বিস্ময় মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক নহে। সে অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্করাজ্যের মধ্যে যখন অনুসন্ধানদূত প্রেরণ করিয়াছিল তখন বড়ো আশা করিয়াছিল যে, ঐ জ্যোতির্ময় অন্ধকারময় ধামে ধূলিকণার নিয়ম নাই, সেখানে অত্যাশ্চর্য একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব; কিন্তু

এখন দেখিতেছে ঐ চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা আমাদের এই ধূলিকণারই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর-সহোদরা। এই নূতন তথ্যটি লইয়া আমরা যে আনন্দ প্রকাশ করি তাহা আমাদের একটা নূতন কৃত্রিম অভ্যাস, তাহা আমাদের আদিম-প্রকৃতি-গত নহে।'

সমীর কহিল, 'সে কথা বড়ো মিথ্যা নহে। পরশপাথর এবং আলাদিনের প্রদীপের প্রতি প্রকৃতিস্থ মানুষ-মাত্রেরই একটা নিগূঢ় আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলায় কথামালার এক গল্প পড়িয়াছিলাম যে কোনো কৃষক মরিবার সময় তাহার পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল যে, অমুক ক্ষেত্রে তোমার জন্য আমি গুপ্তধন রাখিয়া গেলাম। সে বেচারা বিস্তর খুঁড়িয়া গুপ্তধন পাইল না, কিন্তু প্রচুর খননের গুণে সে জমিতে এত শস্য জন্মিল যে তাহার আর অভাব রহিল না। বালকপ্রকৃতি বালক-মাত্রেরই এ গল্পটি পড়িয়া কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। চাষ করিয়া শস্য তো পৃথিবীসুদ্ধ সকল চাষাই পাইতেছে, কিন্তু গুপ্তধনটা গুপ্ত বলিয়াই পায় না— তাহা বিশ্বব্যাপী নিয়মের একটা ব্যভিচার, তাহা আকস্মিক, সেই জন্যই তাহা স্বভাবত মানুষের কাছে এত বেশি প্রার্থনীয়। কথা-মালা যাহাই বলুন, কৃষকের পুত্র তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা মানুষের পক্ষে কত স্বাভাবিক আমরা প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাই। যে ডাক্তার নিপুণ চিকিৎসার দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্য করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি লোকটার 'হাতযশ' আছে। শাস্ত্র-সংগত চিকিৎসার নিয়মে ডাক্তার রোগ আরাম করিতেছে, এ কথায় আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি নাই ; উহার মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্বরূপ একটা রহস্য আরোপ করিয়া তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকি।'

আমি কহিলাম, 'তাহার কারণ এই যে, নিয়ম অনন্ত কাল ও অনন্ত

দেশে প্রসারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেখা হইতে অণুপরিমাণ ইতস্তত করিতে পারে না— সেই জন্যই তাহার নাম নিয়ম এবং সেই জন্যই মানুষের কল্পনাকে সে পীড়া দেয়। শাস্ত্রসংগত চিকিৎসার কাছে আমরা অধিক আশা করিতে পারি না— এমন রোগ আছে যাহা চিকিৎসার অসাধ্য। কিন্তু এ পর্যন্ত হাতযশ-নামক একটা রহস্যময় ব্যাপারের ঠিক সীমানির্ণয় হয় নাই ; এই জন্য সে আমাদের আশাকে কল্পনাকে কোথাও কঠিন বাধা দেয় না। এই জন্যই ডাক্তারি ঔষধের চেয়ে অবধৌতিক ঔষধের আকর্ষণ অধিক। তাহার ফল যে কত দূরপর্যন্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের যত অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি হইতে থাকে, অমোঘ নিয়মের লৌহ-প্রাচীরে যতই সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই মানুষ নিজের স্বাভাবিক অনন্ত আশাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনে, কৌতূহলবৃত্তির স্বাভাবিক নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া আনে, নিয়মকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং প্রথমে অনিচ্ছাক্রমে পরে অভ্যাসক্রমে তাহার প্রতি একটা রাজভক্তির উদ্রেক করিয়া তোলে।'

ব্যোম কহিল, 'কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ অন্তরের ভক্তি নহে, তাহা কাজ আদায়ের ভক্তি। যখন নিতান্ত নিশ্চয় জানা যায় যে জগৎকার্য অপরিবর্তনীয় নিয়মে বদ্ধ, তখন কাজেই পেটের দায়ে, প্রাণের দায়ে, তাহার নিকট ঘাড় হেঁট করিতে হয়। তখন বিজ্ঞানের বাহিরে অনিশ্চয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না ; তখন মাদুলি তাগা জল-পড়া প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্‌ট্রিসিটি ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ হিপ্নটিজ্‌ম্ প্রভৃতি বিজ্ঞানের জাল মার্কা দেখিয়া আপনাকে ভুলাইতে হয়। আমরা নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মকে যে ভালোবাসি তাহার একটা গোড়ার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা

নিয়মের বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে, সে স্বাধীন— অন্তত আমরা সেইরূপ অনুভব করি। আমাদের অন্তরপ্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদৃশ্য বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে স্বভাবতই আমাদের আনন্দ হয়। ইচ্ছার প্রতি ইচ্ছার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ; ইচ্ছার সহিত যে দান আমরা প্রাপ্ত হই সে দান আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়, সেবা যতই পাই তাহার সহিত ইচ্ছার যোগ না থাকিলে তাহা আমাদের নিকট রুচিকর বোধ হয় না। সেই জন্য যখন জানিতাম যে ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন, মরুৎ আমাদিগকে বায়ু যোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তি দান করিতেছেন, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তৃপ্তি ছিল। এখন জানি রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর মধ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য-অযোগ্য প্রিয়-অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্বিকারে যথানিয়মে কাজ করে, আকাশে জলীয় অণু শীতলবায়ু-সংযোগে সংহত হইলেই সাধুর পবিত্র মস্তকে বর্ষিত হইয়া সর্দি উৎপাদন করিবে এবং অসাধুর কুষ্মাণ্ডমঞ্চে জলসিঞ্চন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না— বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে ইহা আমাদের ক্রমে একরূপ সহ্য হইয়া আসে, কিন্তু বস্তুত ইহা আমাদের ভালোই লাগে না।'

আমি কহিলাম, 'পূর্বে আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্ব অনুমান করিয়াছিলাম এখন সেখানে নিয়মের অন্ধ শাসন দেখিতে পাই, সেই জন্য বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্ক-বিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং আনন্দ যত ক্ষণ আমার অন্তরে আছে তত ক্ষণ জগতের অন্তরে তাহাকে অনুভব করিতেই হইবে— পূর্বে তাহাকে যেখানে কল্পনা করিয়াছিলাম সেখানে না হউক তাহার অন্তরতর অন্তরতম স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত না জানিলে

আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার করা হয়। আমার মধ্যে সমস্ত বিশ্বনিয়মের যে একটি ব্যতিক্রম আছে জগতে কোথাও তাহার একটা মূল আদর্শ নাই, ইহা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করিতে চাহে না। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।'

সমীর কহিল, 'জড়প্রকৃতির সর্বত্রই নিয়মের প্রাচীর চীনদেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ় প্রশস্ত ও অভ্রভেদী, হঠাৎ মানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইয়াছে। সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য আবিষ্কার করিয়াছি। দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনন্ত অনিয়ম রহিয়াছে, এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমাদের যোগ ; সেইখান হইতেই সমস্ত সৌন্দর্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য এই সৌন্দর্য ও প্রেমকে কোনো বিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধিতে পারিল না।'

এমন সময়ে স্রোতস্বিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সমীরকে কহিল, 'সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি-বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কী দশা হইয়াছে জান?'

সমীর কহিল, 'না।'

স্রোতস্বিনী কহিল, 'রাত্রে ইঁদুরে তাহা কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। এরূপ অনাবশ্যক ক্ষতি করিবার তো কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।'

সমীর কহিল, 'উক্ত ইন্দুরটি বোধ করি ইন্দুরবংশের একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত

রাত ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। বিচিত্র ঐকতানপূর্ণ সংগীতের আশ্চর্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার বহির ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতেছে। পিয়ানোর তারের সহিত তাহাকে নানা ভাবে একত্র করিয়া দেখিতেছে। এখন বাজনার বই কাটিতে শুরু করিয়াছে ; ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে— মাঝে হইতে সংগীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপরাহত হইবে। আমার মনে এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদান সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি শতসহস্র বৎসরেও বাহির হইবে। অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজমাত্র, এবং তার কেবল তার— কোনো জ্ঞানবান জীব-কর্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার, এই সংস্কারের কেবল একটা এই শুভফল দেখা যাইতেছে যে তাহারই প্রবর্তনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

'কিন্তু এক-এক দিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং অন্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্য মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কী ? সে একটা রহস্য বটে। কিন্তু সে রহস্য নিশ্চয়ই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশ শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।'

ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২